بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
الحمد لله رب العٰلمين والصلٰوة والسلم علٰى رسوله محمد واله واصحابه اجمعين والعاقبة للمتقين

রমযান নির্দেশিকা

প্রফেসর ড. মো: আব্দুল্লাহেল বাকী

কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

রমযান নির্দেশিকা
প্রফেসর ড. মো: আব্দুল্লাহেল বাকী

প্রকাশনায় :
কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১/৯ জালেশ্বর, ব্লক বি, (রেডিও কলোনী) সাভার, ঢাকা। ফোন: ৭৭৪৩৬৩৫

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০০৪
পরিমার্জিত প্রথম সংস্করণ: জুলাই ২০১৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুলাই ২০১৩

প্রাপ্তিস্থান :
কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১/৯ জালেশ্বর, ব্লক বি, সাভার। ৭৭৪৩৬৩৫
ভেকটোরাস ৩/৪-এ, পুরানা পল্টন, ৬ষ্ঠ তলা, রুম নং-৬০৩, ঢাকা। ০১৫৫৩৫৪০৩৯৪
জেনেসিস ৭৩ সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা। ৯৩৪৮১৬৯, ৯৩৩৪৬০৮, ০১৫৫৫৩৩৩৭৭৭
ঠান্ডা গরম রাজলক্ষী কমপ্লেক্স, উত্তরা, ঢাকা। ৮৯৫৬৯৪, ৮৯৫৫৬৯৫
চিকেন কিং সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা। ৯৬৬৯৬৮৯, ৮৬২০৭৫১

অলংকরণ : ভেকটোরাস
প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ : জেনেসিস

মূল্য : ৮০ টাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার অতীব দয়ালু পরম করুণাময় মালিক গোটা বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি এক এবং একক, তাঁর কোন শরিক নেই। তিনি সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন, সকল সম্পদ তাঁরই মালিকানাধীন এবং তিনিই সকল শক্তি ক্ষমতার একমাত্র উৎস।

দরূদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (স.) এর উপরে যিনি রমযান সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রচার করেছেন এবং রমযানের করণীয় যাবতীয় বিষয়াদি সুন্দরতম উপায়ে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সুনাম সুখ্যাতি বৃদ্ধি করুন, সম্মান ও মর্যাদার শ্রেষ্ঠতম আসনে তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন এবং আমাদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যে সাহায্য করুন। অন্যান্য নবী ও রসূলগণ (আ.) তাঁদের সঙ্গী-সাথী (রা.) এবং আল্লাহ তায়ালার সকল প্রিয়তম বান্দাগণের কথা আমি স্মরণ করছি, যারা সফলভাবে রমযান পালন করেছেন এবং মহান মালিককে সন্তুষ্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে আছেন।

আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়ায় ২০০৪ সালে 'মাহে রমযান নির্দেশিকা' নামে একটি বই লিখেছিলাম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি মসজিদে রমযানের তারাবিহ শেষে কুরআনের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতাম মূলত: সেটাকে সন্নিবেশিত করেই বইটি প্রকাশ করেছিলাম। গত ৮/৯ বছর ধরে বইটির পুনর্মুদ্রণের চিন্তা ভাবনা চলছিল। বেশ কিছু বিষয় সংযোজনের মাধ্যমে বইটিকে একটি নতুন আঙ্গিকে সাজানোর চেষ্টা করেছি। বিষয়গুলিতেও কিছু পরিবর্ধন করেছি। খতম তারাবিহর সার সংক্ষেপ এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে নিজেই একটি আলাদা বই আকারে প্রকাশ হওয়ার পর্যায়ে এসেছে। সেজন্যে এখানে তা দেয়া হয়নি। বইটিতে রমযান ও রোযার পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি রমযানের ব্যাপকতা সম্পর্কে পাঠকের ধারণাতে ব্যাপক পরিবর্তন হবে।

বইয়ের বিষয়বস্তুগুলি সম্বন্ধে মহান আল্লাহ আমাকে ধারণা দিয়েছেন। সেগুলিকে পাঠ্য উপযোগী করার ক্ষেত্রে জেনেসিসের জাহিদুর রহমানকে যে অবিস্মরণীয় যোগ্যতা দিয়েছেন তা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। এছাড়া বইটির কাজে আমি তাঁর অফিসে থেকেছি, তাঁর বাসায় খেয়েছি, এবং অনেক সময় রাতও কাটিয়েছি। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ের আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন এ কামনা করি।

ভেক্টোরাসের আতিকুর রহমান ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক নানাবিধ জটিল সমস্যাদির মধ্যেও বইটি দ্রুত প্রকাশের ব্যাপারে অকৃপণভাবে সময় দিয়েছেন এবং ধৈর্য ধরে আমার অসহনীয়

ও বেপরোয়া কাটা ছেড়া সংশোধন করেছেন এবং মনের মাধুরি দিয়ে অতীব যত্নের সাথে শব্দ বিন্যাস ও পৃষ্ঠার অলংকরণ সম্পন্ন করেছেন। তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার বাবা ও মা, ভাই ও বোন, স্ত্রী ও সন্তান, আমার ছেলেবেলার কুরআন শিক্ষক উত্তর নওগাঁ জামে মসজিদের হাফেজ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা মসজিদ, নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটির মুসলিম স্টুডেন্ট সোসাইটি মসজিদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কমিউনিটি মসজিদ এবং কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী সহ সংশ্লিষ্ট যারাই রমযানকে আমার জীবনের গভীরে প্রতিষ্ঠিত করতে অবদান রেখেছেন, তাদের জন্য মাগফিরাত এবং কুরআন ও রোযার শাফায়াত একান্তভাবে কামনা করছি।

আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। ভুল-ভ্রান্তি মাফ করুন। রমযানের সাফল্য অর্জনকারীদের মধ্যে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করুন।

প্রফেসর ড. মো: আব্দুল্লাহেল বাকী

জুলাই ২০১৩

রমযান মাস

আমাদের জীবন ও জগতের সকল কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টিত হয় সময়ের হিসেবে। দিন সপ্তাহ মাস বছর ইত্যাদি দিয়ে পরিমাপ করি সবকিছু। সময়ের প্রবর্তক ও পরিচালক মহান আল্লাহতায়ালা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে বারটি মাস দিয়ে বছরের হিসাব নির্ধারণ করেছেন।

"নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে এবং জেনে রাখো, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন। (সূরা তওবা: ৩৬)

হিজরী সনের নবম মাসের নাম রমযান। 'রময' শব্দের অর্থ হলো কোন কিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভষ্ম করে দেয়া। নষ্ট-ভ্রষ্ট, পুরাতন, অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক যে কোন কিছুকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা। এ দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের সকল পাপ, অন্যায় ও গুনাহকে যে মাসে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, সে মাসই হলো রমযান। রমযান মাসে মানুষ তার কুপ্রবৃত্তিগুলোকে ধ্বংস করে সৎ ও সফল মানুষ হিসেবে জীবন যাপনের পথে অগ্রসর হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে একমাত্র এ রমযানের নাম, এর মর্যাদার কারণ উল্লেখ করে এ মাসকে মহিমান্বিত করেছেন। রমযান সেজন্যে আর অন্য সব মাসের মত নয়। স্রষ্টায় বিশ্বাসীদের নিকটে রমযানের তাই অনেক দাম, অনেক মর্যাদা।

আধুনিক সময়ে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে রমযান মাসকে রোযার মাস হিসেবে বিবেচনা করে। ইদানীং বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশের ব্যবসায়ীগণ রমযান মাসকে ঈদের মাস মনে করে। অথচ রোযা (সিয়াম) এবং রমযান সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়। রমযান হলো একটি মাসের নাম। রোযা হলো একটি বিশেষ ইবাদতের নাম যা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। রমযান মাস ছাড়াও বছরের অন্য মাসে সুন্নত, নফল, কাযা ইত্যাদি রোযা পালন করা হয়। সেক্ষেত্রে রোযা (সিয়াম) ও রমযান মাসকে সমার্থক মনে করা অথবা দুটি বিষয়কে একই ভাবা ঠিক নয়। রোযা পালন ছাড়াও রমযানের সাথে জড়িয়ে আছে অনেক আনুষ্ঠানিকতা।

রমযান মাস সম্পর্কে কুরআন ও রসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসসমূহে অগণিত করণীয় বিষয় ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

"রমযান মাস, তাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত, সরলপথ-প্রাপ্তির স্পষ্ট নিদর্শন ও হক বাতিলের পার্থক্যকারী। কাজেই, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস

পাবে সে যেন অবশ্যই এর রোযা রাখে এবং কেউ পীড়িত হলে কিংবা সফরে থাকলে, তাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজসাধ্যতা চান, তোমাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে চান না। এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং যাতে তোমরা এ কারণে আল্লাহ্র মহিমা বর্ণনা কর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন, আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা বাকারা—১৮৫)

সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) শাবান মাসের শেষ দিন আমাদের সম্বোধন করে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বললেন, "জনগণ! এক মহাপবিত্র ও বরকতের মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছে। এ মাসের একটি রাত বরকত ও ফযীলত-মাহাত্ম্য ও মর্যাদার দিক দিয়ে সহস্র মাস অপেক্ষাও উত্তম। এ মাসে আল্লাহ্ তায়ালা রোযা ফরয করেছেন এবং এর রাতগুলোতে আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়ানোকে নফল ইবাদত রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। যে লোক এ রাতে আল্লাহ্র সন্তোষ ও তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন সুন্নত বা নফল আদায় করবে, তাকে এর জন্য অন্যান্য সময়ের ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব দেয়া হবে। আর যে লোক এ মাসে ফরয আদায় করবে, সে অন্যান্য সময়ের সত্তরটি ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব পাবে। এটা সবর, ধৈর্য ও তিতিক্ষার মাস। আর সবরের প্রতিফল আল্লাহ্র নিকট জান্নাত পাওয়া যাবে। এটা পরস্পর সহৃদয়তা ও সৌজন্য প্রদর্শনের মাস। এ মাসে মুমিনের রিযিক প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার ফলস্বরূপ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে ও জাহান্নাম হতে তাকে নিষ্কৃতি দান করা হবে। আর তাকে আসল রোযাদারের সমান সওয়াব দেয়া হবে; কিন্তু সেজন্য আসল রোযাদারের সওয়াব কিছুমাত্র কম করা হবে না। আমরা নিবেদন করলাম, হে রসূলুল্লাহ্ (স.), আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই রোযাদারকে ইফতার করাবার সামর্থ রাখে না। এই দরিদ্র লোকেরা এই সওয়াব কিভাবে পেতে পারে? তখন রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, যে রোযাদারকে একটি খেজুর, দুধ বা এক কোষ সাদা পানি দিয়েও ইফতার করাবে, তাকেও আল্লাহ্ তায়ালা এ সওয়াবই দান করবেন। আর যে একজন রোযাদারকে পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্ত করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে আমার 'হাওয' হতে এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। এটা এমন এক মাস যে, এর প্রথম দশদিন রহমতের বারিধারায় পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় দশদিন ক্ষমা ও মার্জনার জন্য এবং শেষ দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট। আর যে এ মাসে নিজের অধীন লোকদের শ্রম-মেহনত হ্রাস করে দেবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি ও মুক্তিদান করবেন। — (বায়হাকী)

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, গোটা মানব জাতির মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (স.) সবচেয়ে বড় দানশীল ছিলেন। রমযান মাসে জিবরাঈল (আ.) যে সময় তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন সে সময় তিনি সবচেয়ে বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন। জিবরাঈল (আ.) রমযান মাসে প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। এভাবেই রমযান মাস অতিবাহিত

হত। নবী (স.) (এ সময়) তার সামনে কুরআন শরীফ পড়ে শুনাতেন। যখন জিবরাঈল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি গতিবান বায়ুর চেয়েও বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন। (বুখারী)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, রমযান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জিনদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এর একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং এর একটি দরজাও তখন আর বন্ধ করা হয় না। (এ মাসে) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেন হে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত! বিরত হও। আর এ মাসে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জাহান্নাম থেকে বহু লোককে মুক্তি দেয়া হয় এবং প্রতি রাতেই এরূপ হতে থাকে। (তিরমিযী)

কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী রমযান মাসের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য সমূহের সার-সংক্ষেপ:

রমযান মাসের গুরুত্ব

- রমযান মাস কুরআন নাযিলের মাস।
- রমযান মাস ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ রোযা রাখার মাস।
- রমযান মাস আল্লাহ তায়ালার মহিমা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাস।
- রমযান মাসে রয়েছে ক্বদরের রাত্রি যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।
- রমযান মাস বরকতের মাস।
- রমযান মাস নফল ইবাদতের মাস।
- রমযান মাস অতিরিক্ত সওয়াব অর্জনের মাস।
- রমযান মাস ধৈর্য ও তিতিক্ষার মাস।
- রমযান মাস রিযিক প্রশস্ত হওয়ার মাস।
- রমযান মাস রহমত (অনুগ্রহ) মাগফেরাত (ক্ষমা) নাজাত (মুক্তি) এর মাস।
- রমযান মাস দান করার মাস।
- রমযান মাস কুরআন শোনা ও শোনানোর মাস।
- রমযান মাস শয়তান ও দুষ্ট জিনদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করার মাস।
- রমযান মাস জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়ার মাস।
- রমযান মাস জান্নাতের দরজা খুলে দেয়ার মাস।
- রমযান মাস কল্যাণ গ্রহণ করা, পাপ থেকে বিরত থাকা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস।
- রমযান মাস দুআ কবুলের মাস।

রমযান মাসের বৈশিষ্ট্য

- রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। রোযাদারকে সুবহে সাদিকের পূর্বে সেহেরী এবং দিন শেষে ইফতার খেতে হয়।
- রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল/তারাবিহর নামায আদায় করা হয়।
- রমযান মাসে ফিতরা দেয়া হয়।
- রমযান মাসে ইতিকাফ করা হয়।

রমযান মাস নিয়ম নীতি পালনের মাস

সৃষ্টিজগতের সবখানে সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। এ নিয়মের সামান্য অন্যথা হলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে। যে মানুষ যত বেশি নিয়ম অনুযায়ী চলে, সে জীবনে তত বেশি সমৃদ্ধ হয়। যে অফিস নিয়ম কানুনের ব্যাপারে বেশি সচেতন, সে অফিস তত উন্নতি করে। যে দেশের সরকার ও জনগণ দেশের আইনকে যত বেশি শ্রদ্ধা করে, সে দেশ ও জনগণ তত বেশি উন্নতি করে।

মানুষের প্রধান শত্রু শয়তান মানুষকে অনিয়মের মধ্যে টেনে আনে। শয়তান আইন বা নিয়ম তৈরির ব্যাপারে স্রষ্টার অধিকারে মানুষকে হস্তক্ষেপ করায়, আইন অমান্য করে নিয়ম ভঙ্গ করে সুবিধা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে এবং অনিয়মকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। ফলে শয়তানের প্ররোচনায় অনিয়মের আবর্জনায় লন্ড ভন্ড হয়ে যায় পৃথিবীর সবকিছু।

সুন্দরভাবে দেশ পরিচালনার জন্য সরকার প্রতি পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় এসে প্রচুর সময় শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করে নিয়ম তৈরি করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেসব নিয়ম অনেক সময় গ্রহণযোগ্য হয় না। নুতন নিয়ম প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে হয়। অনেক খড়-কুটা পুড়িয়ে নিয়মের পাহাড় গড়ে আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক দেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিয়ম তৈরি হয়। কিন্তু কোন নিয়ম স্থায়ী হয় না, শান্তিও ফিরে আসে না।

আল্লাহ তায়ালা রমযান মাসে বিভিন্ন কলা-কৌশল ও কার্যকরী ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে নিয়ম পালনের আওতায় নিয়ে আসেন। রমযানের রোযা পালন খাদ্য নিয়ে সব অনিয়মের লাগাম টেনে ধরে। সুনির্দিষ্ট সময়ে সেহরী ও ইফতারীর অভ্যাস রোযাদারকে খাদ্য গ্রহণের নিয়মের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ও সজাগ বানিয়ে দেয়।

ঘুম বিশ্রাম ও আরাম আয়েশসহ যাবতীয় ব্যাপার রমযানের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা একেবারে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

রমযানের একটি মাসের নিয়ম পালনের অভ্যাস বছরের বাকি সময়ে দৈনন্দিন কার্যক্রমের সকল দায়িত্ব সঠিক সময় ও নিয়মানুযায়ী করার প্রশিক্ষণ দেয়।

রমযান মাস ও সিয়াম (রোযা) সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত

রমযান মাসের গুরুত্ব, এ মাসে করণীয় ও সিয়াম পালনের পদ্ধতি

হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। (সূরা বাক্বারা : ১৮৩)

সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিবে। এটি যাদের অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদয়া-একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে সেটি তার জন্যে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্যে অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে। (সূরা বাক্বারা : ১৮৪)

রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেউ অসুস্থ হলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না, এজন্যে যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। (সূরা বাক্বারা : ১৮৫)

আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। (সূরা বাক্বারা : ১৮৬)

সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীকে বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার করো

যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে ঊষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাহাদের সহিত সংগত হয়ো না। এইগুলি আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এইগুলির নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে। (সূরা বাক্বারা : ১৮৭)

হজ্জের আহকাম পালনে ব্যর্থতা এবং সিয়াম

তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করবে। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানীর করে তার ফিদয়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের পূর্বে উমরা দিয়ে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে সে হজ্জের সময় তিন দিন এবং বাড়ি ফিরে সাত দিন, এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করবে। এটি তাদের জন্যে, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। (সূরা বাক্বারা: ১৯৬)

হে মু'মিনগণ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করো না; তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সেটা হত্যা করলে যা সে হত্যা করে তাহার বিনিময় হবে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক-কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানী কুরবানীরূপে। অথবা সেটার কাফ্ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ তার শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা। (সূরা মায়িদা: ৯৫)

হত্যার কাফফারা এবং সিয়াম

কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা ভিন্নকথা এবং কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সংগতিহীন সে একাধিক্রমে

দু মাস সিয়াম পালন করবে। তওবার জন্য এটি আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা: ৯২)

শপথের কাফফারা এবং সিয়াম

তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সে সবের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। অতঃপর সেটার কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনকে খেতে দাও, অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি এবং যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটিই তোমাদের শপথের কাফফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করিও। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সূরা মায়িদা: ৮৯)

আল্লাহর ক্ষমা এবং প্রতিদান প্রাপ্ত মু'মিন ও সিয়াম

অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী — এদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। (সূরা আহ্যাব : ৩৫)

যিহারের কাফফারা এবং সিয়াম

যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এ দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেয়া যাচ্ছে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।

কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাধিক্রমে দু মাস সিয়াম পালন করতে হবে; যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে; এটি এজন্যে যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান; কাফিরদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা মুজাদালা : ৩-৪)

রমযান মাস ও সিয়াম (রোযা) সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস

সওমের মর্যাদা

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমল দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ বলেছেন, তবে রোযা ব্যতিত। কারণ (বান্দাহ) আমারই জন্যে রোযা রাখে। আমিই এর প্রতিফল দান করবো। সে আমারই জন্যে নিজ প্রবৃত্তি দমন করে এবং খানা-পিনা পরিত্যাগ করে। রোযাদারের জন্যে দুটি বড় আনন্দ রয়েছে। একটি আনন্দ ইফতারের সময় আর অপরটি তার রবের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারদের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধি অপেক্ষাও অধিক সৌরভময়। রোযা হচ্ছে একটি ঢাল স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন রোযা রাখার দিন অশ্লীল কথা না বলে এবং নিরর্থক শোরগোল না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় কিংবা তার সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করতে উদ্ধত হয়, তখন যেন সে বলে, আমি রোযাদার। (বুখারী-মুসলিম)

রোযা ও রাতের নামায দ্বারা গুনাহ্ মাফ হয়

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে সাওম পালন করবে, তার সকল অতীত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। তদ্রুপ যে ব্যক্তি রমযানের রাত্রে নফল নামায (তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ) ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে পরবে, তারও অতীতের সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। অনুরূপ কদরের রাতে যে ব্যক্তি ইমান ও ইহতিসাবের সাথে নফল নামায আদায় করবে, তারও পূর্বের সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী-মুসলিম)

রোযা ও কুরআনের শাফাআত

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, সাওম এবং কুরআন উভয়ে বান্দার জন্যে সুপারিশ করবে। সাওম বলবে, হে প্রতিপালক! আমি এ বান্দাকে দিনের বেলা পানাহার এবং প্রবৃত্তির বাসনা পূরণ করা থেকে বিরত রেখেছিলাম; আজ তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা শয়ন ও নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। তাই, হে প্রতিপালক! তার পক্ষে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর ঐ বান্দার পক্ষে কুরআন ও সাওম উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। (বায়হাকী)

রমযানের একটা রোযাও যদি ছুটে যায়, তবে সে ক্ষতি পূরণ হয় না

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি শরয়ী রুখসুত কিংবা রোগ ব্যতীত রমযানের একটা রোযাও ছেড়ে দেয়, তারপরে যদি জীবন ভরও রোযা রাখে, তবুও তার ক্ষতি পূরণ হবে না। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ)

রোযা রেখে গোনাহ্ থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখে অন্যায় কথা ও অন্যায় কাজ ত্যাগ করে না, তবে তার ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকার কোন প্রয়োজন আল্লাহর নেই। (বুখারী)

রমযান মাসের সর্বশেষ রাত

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, রমযান মাসের সর্বশেষ রাত্রে তাঁর উম্মাতের গোনাহ্ মাফের ফয়সালা দেয়া হয়। জিজ্ঞেস করা হলো- ইয়া রসূলুল্লাহ! ঐ রাত কি তা হলে ‘লাইলাতুল কদর’? রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, লাইলাতুল কদর নয় বটে, তবে কথা হলো, শ্রমিক যখন তার শ্রম পূর্ণভাবে করে, তখন তার পারিশ্রমিক পূর্ণ করে দেয়া হয়। (আহমদ)

ইতিকাফ

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) সর্বদা রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর এ আমল অব্যাহত থাকে। তাঁর ইন্তিকালের পরে তাঁর স্ত্রীগণ (রা.) ইতিকাফ করতে থাকেন। (বুখারী, মুসলিম)

চাঁদ দেখা

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। যদি ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না যায়, তবে শাবান মাসের হিসাব ৩০ দিন পূর্ণ কর। (বুখারী মুসলিম)

রমযানের দু-এক দিন পূর্বে রোযা রাখা নিষেধ

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন রমযানের দু এক দিন পূর্ব থেকে রোযা না রাখে। (বুখারী, মুসলিম)

সাহরী ও ইফতার সম্পর্কিত

আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, আমাদের রোযা ও আহলি কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয় হচ্ছে সেহরী খাওয়া। (মুসলিম)

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন, আমার নিকট সে বান্দাহ্ সবচেয়ে প্রিয়, যে রোযার ইফতার অবিলম্বে করে। (তিরমিযী)

রোযাদারকে ইফতার করানোর সওয়াব

ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে কিংবা আল্লাহর পথে লড়াইকারী কোন মুজাহিদকে লড়াইয়ের সরঞ্জাম দিবে, আল্লাহ্ তাকে ঐ রোযাদার ও মুজাহিদের অনুরূপ সওয়াব দান করবেন। (বায়হাকি)

রমযানের শেষ দশ দিন এবং লাইলাতুল কদর

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশ দিন যখন আরম্ভ হত, তখন রসূলুল্লাহ্ (স.) কোমর বেধে নিতেন এবং রাত জাগতেন এবং নিজের পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে দিতেন। (বুখারী, মুসলিম)

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তোমরা ‘লাইলাতুল কদর তালাশ কর রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে। (বুখারী)

সফর অবস্থায় রোযা

আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, হামযা ইবন আম্‌র আসলামী, যিনি অধিক রোযা রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি সফর অবস্থায় রোযা রাখব? রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, মনে চায় রাখ, মনে চায় না রাখ। (বুখারী, মুসলিম)

ফরয রোযার কাযা

আয়িশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সময় আমরা যখন হায়েয অবস্থায় থাকতাম তখন আমাদেরকে কাযা রোযা আদায় করার হুকুম দেয়া হত, কিন্তু কাযা নামায পড়ার হুকুম দেয়া হত না। (মুসলিম)

রমযান মাস কুরআন অবতীর্ণের মাস

কুরআন প্রেরণের প্রেক্ষাপট

মানুষ সৃষ্টির সেরা। এর প্রধান কারণ তার জ্ঞান বুদ্ধি। পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনিই মানুষকে দয়া করে কয়েকটি ধাপে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করেছেন।

- আদম (আ.) কে সৃষ্টির পরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যাবতীয় বিষয়ের নাম শিক্ষা দেন।
- ইবলিশ (শয়তান) যে আদম (আ.) এর শত্রু সবার সামনে তা প্রত্যক্ষ করান।
- আল্লাহ তায়ালা আদম ও হাওয়াকে জান্নাতে বসবাসের নিয়ম-কানুন বলে দেন এবং শয়তান যেন তাদেরকে বিপথে নিতে না পারে সে ব্যাপারে সাবধান করে দেন।
- আদম ও হাওয়া (আ.) যখন শয়তানের চক্রান্তে ভুল করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে বাঁচার পথ বলে দেন এবং ক্ষমা করেন।
- আদম ও হাওয়া (আ.) কে যখন পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, তখন দুনিয়ার জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন। সে অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী ও রসূলদের মাধ্যমে মানুষের জন্য কিতাব প্রেরণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় মানুষের জন্য শেষ কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ করেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (স.) এর নিকটে।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য

- কুরআন আল্লাহর বাণী।
- কুরআনের জ্ঞান বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ।
- কুরআন সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত।
- কুরআনের মধ্যে কোন মানুষ একক বা দলগতভাবে কোন পরিবর্তন করতে পারে না।
- কুরআন আল্লাহর পরিচয়, তাঁর শক্তি-ক্ষমতা, দয়া-অনুগ্রহ এবং অধিকার, মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়।
- কুরআন বিশ্ব জাহানের সৃষ্টি, পরিচালনা ও পরিণতি সম্পর্কিত যাবতীয় রহস্য উদঘাটনে সাহায্য করে।
- কুরআন জীবনের সূচনা ও বিস্তৃতি এবং মৃত্যুর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোকপাত করে।
- কুরআন এসেছে মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য।

- কুরআন মানব সভ্যতার অতীত ইতিহাস বর্ণনা করে।
- কুরআন সকল মহামানবদের কথা এবং ব্যর্থ মানুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে।
- কুরআন মানুষের পরিচয়, তার দায়-দায়িত্ব এবং পরিণতি সম্বন্ধে বিবরণ দেয়।
- কুরআন মানুষের জন্য কি করণীয় কি বর্জনীয় তা বর্ণনা করে।
- কুরআন মানুষের বন্ধু ও উপকারীদের বিবরণ দেয়।
- কুরআন মানুষের শত্রু ও ক্ষতিকারীদের বিবরণ দেয়।
- কুরআন মানুষের প্রধান শত্রু শয়তানের পরিচয়, তার কর্মপদ্ধতি এবং তার হাত থেকে বাঁচার উপায়-পদ্ধতি তুলে ধরে।
- কুরআন কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে।
- কুরআন জান্নাত ও জাহান্নামের বিস্তারিত বিবরণসহ পরকালের চিত্র তুলে ধরে।

কুরআন আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। স্বচ্ছ, সহজ, যুক্তিসংগত ও পবিত্র কিতাব। এর পরশে মানুষ সত্যিকার কল্যাণ ও চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে, অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরে আসে।

কুরআন শিক্ষার পদ্ধতি

- বিশুদ্ধ ও সুন্দর তিলাওয়াত।
- অর্থ, ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ, তাৎপর্য, শিক্ষা।
- হিকমত/প্রজ্ঞা, নিগুঢ় তত্ত্ব বা রহস্য অনুধাবন।
- বাস্তব জীবনে কুরআনের বিধান অনুসরণ।
- কুরআনের প্রচার।

কুরআন শিক্ষার পথে বাধাসমূহ

- কুরআনকে কঠিন মনে করা। বিশেষ করে যেসব জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আরবী নয়, তারা কুরআন বুঝা তো দূরের কথা, সাধারণ তিলাওয়াতও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এমন মনে করা।
- কুরআন শুধু তিলাওয়াত করে অসীম সওয়াব হাসিল করা সম্ভব; বুঝা ও অনুধাবন করার তেমন প্রয়োজন নেই মনে করা।
- দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর ও স্বার্থক করার ব্যাপারে কুরআনের কোন ভূমিকা নেই এবং কুরআনকে শুধুমাত্র পরকালের জীবনের জন্য কল্যাণের উৎস মনে করা।

- কুরআন শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার কার্যক্রমকে সহজ, সংক্ষিপ্ত, আকর্ষণীয় ও সময়পোযোগী করতে না পারা।
- আধুনিক জীবন যাপনের জটিল অবস্থানে মানুষের কল্পনাতীত ব্যস্ততায় কুরআন পাঠের জন্য নিয়মিত সময় দিতে না পারা।
- আধুনিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কুরআনের শিক্ষাকে প্রাধান্য না দেয়া।

কুরআন ও রমযানের সম্পর্ক

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চান তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ কুরআন পড়ুক, কুরআন বুঝুক, কুরআন অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলুক। জীবনকে সফল ও সার্থক করুক। সারাটা বছর নানা কারণে মানুষ কুরআনের সংস্পর্শে আসতে না পারায় তার জীবন ব্যর্থ হয়। তাই অসীম দয়ালু ও পরম মেহেরবান আল্লাহ মানুষকে কুরআনের সংস্পর্শে আসার বিশেষ সুযোগ করে দেন রমযানে।

কুরআন আল্লাহর এক বিশেষ রহমত, অবতীর্ণ হয়েছে রমযান মাসে। রমযান কুরআন গ্রহণ করে মর্যাদাশীল হয়েছে। যে রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে রাতটি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এটিও কুরআন গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। একইভাবে মানুষও কুরআন গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে।

- রমযান নানাভাবে মানুষকে কুরআন গ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়।
- রমযানে কুরআন গ্রহণ, বুঝা, আমল, প্রচার করা সহজ।
- রমযান মাস কুরআন শোনার মাস, শোনানোর মাস।
- কুরআনের প্রতি হরফে রয়েছে পুণ্য। রমযানে প্রতি পুণ্য ৭০-৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
- রমযানে শয়তান বন্দি থাকার কারণে কুরআনের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ বাড়ে, সময় হয়।
- খতম তারাবিহর ব্যবস্থাপনা ও মসজিদে হাফেজদের উপস্থিতি কুরআন চর্চার জন্য পরিবেশকে সহজ করে।
- রমযান কতটা সফল তা পরিমাপ করা যায়, কুরআনের দিকে মানুষ কতটা অগ্রসর হয় তার উপর। কারণ কুরআন অবহেলা করে অন্য কোন উপায়ে রমযানকে সফল করা সম্ভব নয়।

কুরআন সম্পর্কে করণীয়

- কুরআনের গুরুত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করুন। এ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিন।
- যদি কুরআন তিলাওয়াত করতে না জানেন, কালবিলম্ব না করে যে কারও সাহায্য নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। এটাকেই কুরআনের সাথে সম্পর্ক তৈরির প্রথম কর্মসূচি নির্ধারণ করুন।

- রমযান মাসে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করার প্রস্তুতি নিন।
- কুরআন বিশুদ্ধ কিতাব। এর শব্দ, ভাব, ভাষা, উপস্থাপনা, বিষয়বস্তু, তথ্যাদি সবকিছুই সুন্দর, পবিত্র ও সঠিক। সুতরাং আপনার তিলাওয়াত উন্নত ও সুন্দর করার পদক্ষেপ নিন।
- মুখস্থ সূরা বা আয়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। ছোট ছোট সূরা এবং গুরুত্বপূর্ণ আয়াত মুখস্ত করার পরিকল্পনা নিন।
- কুরআনের বাংলা অনুবাদ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পড়ুন।
- যে সব সূরা নামাযে পড়েন সেগুলির অর্থ অবশ্যই জেনে নিন।
- কুরআনের বিশেষ বিশেষ সূরা বা আয়াতের ব্যাখ্যা, তাৎপর্য, শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন।
- রমযান, রোযা ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআনের আয়াত অর্থসহ মুখস্ত করুন।
- ভাল একাধিক অনুবাদ, তাফসীর, হাদীসের কুরআন সম্পর্কিত অধ্যায় পাঠ, বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করুন।
- আপনার চারপাশের লাখো কুরআন না জানা মানুষকে কুরআনের সংস্পর্শে আনার চেষ্টা করুন। প্রথমেই আপনার পরিবার থেকে শুরু করুন। আপনার স্বামী/স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বাবা-মা, ভাই-বোন, অন্য কোন আত্মীয়, কাজের মানুষ, ড্রাইভার যে কেউ আপনার সংসারে থাকেন খাওয়া দাওয়া করেন কাজ করেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা কুরআন পড়তে পারেন না তাদের দিয়ে সূচনা করুন। আপনার প্রতিবেশী, সহপাঠী, সহকর্মী বন্ধু বান্ধব পরিচিতজন, অফিস, ফ্যাক্টরী, মিল কারখানা বা ফার্মের অধীনস্তজনকে কুরআন শিক্ষার আওতায় আনুন।
- যারা লিখতে পারেন, তাঁরা ২/১ টি প্রবন্ধ, কবিতা বা বিষয়ভিত্তিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখুন।
- যারা বলতে পারেন তাঁরা কুরআনের গুরুত্ব, কুরআন শিক্ষার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন।
- প্রচার মাধ্যমের কর্মীগণ এ মাসে কুরআন বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের পরিকল্পনা নিন। ছোট বড় সবধরনের কর্মকাণ্ড জনসাধারণের সামনে তুলে ধরুন। কুরআন সম্পর্কে যতসব ভুল ধারণা সেসব খণ্ডন করে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করুন।
- রমযান মাসে শয়তান বন্দি থাকে। ফলে এটাই বিরাট সুযোগ। এর সদ্ব্যবহার করুন। শয়তান ফিরে আসার আগেই কুরআন গ্রহণ করুন।

রমযান মাস সিয়াম বা রোযা পালনের মাস

সিয়াম আরবী শব্দ। সিয়ামের ফার্সী ও উর্দু অনুবাদ হলো রোযা। বাংলাতে সিয়ামের অন্য কোন অনুবাদ আছে কিনা আমার জানা নেই। অনেকে উপবাস বলেন, কিন্তু উপবাস শব্দ দিয়ে সিয়ামকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় না। বাংলা ভাষাভাষীরা সিয়ামকে রোযা বলেই জানে।

রোযা ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি। রমযান মাসে রোযা পালন প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয (শরয়ী কয়েকটি কারণ ব্যতীত)। কোন মুসলিম রোযা পালনকে অস্বীকার বা অমান্য করলে সে আর মু'মিন থাকেনা।

রোযা একটি কষ্টকর ইবাদত

- না খেয়ে থাকতে হয়, ক্ষুধার জ্বালা ইচ্ছে করে সহ্য করতে হয়।
- যৌন চাহিদা পূরণ করা যায় না।
- শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে সেহরী খেতে হয়।
- অভ্যাসগত খারাপ আচরণগুলো ঠিক করে চলতে হয়।
- এক মাস ধরে অনেক কষ্ট করে দীর্ঘ তারাবীহর নামায পড়তে হয়।
- রোযা রেখে নিত্যনৈমিত্তিক অন্যান্য কাজ করতে হয়।
- দীর্ঘ একটি মাস প্রতিদিন কমবেশী ১২ ঘন্টা রোযা পালন করতে হয়।
- রমযান মাসে শুধু দিনের বেলার রোযাই নয় বরং দিন রাত ২৪ ঘন্টাই আল্লাহর বিধি-নিষেধ মোতাবেক চলার জন্য সতর্ক থাকতে হয়। এগুলি বাইরে থেকে তেমন বুঝা যায় না, কিন্তু বাস্তবে এটা মোটেও হালকা বিষয় নয়।

রোযা শুধু কষ্ট দেয়ার জন্য নয়

রোযা কষ্টকর, তবে এটাকে মানুষের ধারণক্ষমতা বহনক্ষমতা পালনক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

- প্রত্যহ দিন শেষে ইফতারী এবং শেষ রাতে সেহরীর ব্যবস্থা আছে। ইফতারী সময় হওয়ার সাথে সাথে এবং সেহরী রাতের শেষ অংশে সম্পন্ন করার নির্দেশ আছে।
- দিন রাত ২৪ ঘন্টা বা একাধারে ২-৩ দিন বা সপ্তাহব্যাপী রোযা রাখার নির্দেশ নেই।
- অসুস্থতা এবং সফরে রোযা পালন আবশ্যক করা হয়নি।
- শারীরিক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে রোযা ভাংগার অনুমতি আছে।

রোযার পুরস্কার

- ♦ আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেছেন "রোযা আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর পুরস্কার দিব"।
- ♦ রোযা পালনকারীর জন্য রোযা পরকালে সুপারিশ করবে এবং তা কবুল করা হবে।
- ♦ রোযা পালনকারীরা 'রাইয়ান' নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- ♦ রোযা পালনকারীর জন্য দুটি খুশির সময় রয়েছে। একটি ইফতারের সময়, অন্যটি তার প্রতিপালকের সংগে সাক্ষাতের সময়।
- ♦ রোযা পালনকারীর সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।
- ♦ রোযা পালনকারী ঈদের মাঠে সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হবে।

রোযা পালনের উদ্দেশ্য

রোযা পালনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে তাকওয়া অর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাকওয়া ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সাধারণভাবে তাকওয়া অর্থ হলো আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা অথবা সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করা। তাকওয়ার গুণাবলী অর্জনকারীকে মুত্তাকী বলা হয়। মুত্তাকীর সংগা ও বৈশিষ্ট্য, মুত্তাকী হওয়ার উপায় পদ্ধতি এবং মুত্তাকী হওয়ার গুরুত্ব তাৎপর্য সম্পর্কে কুরআনে অসংখ্য আয়াত এবং রসূলুল্লাহ (স.) এর অনেক হাদীস রয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতিকে প্রথমত: দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী।

- ♦ বিশ্বাসীরা আবার চার শ্রেণীতে বিভক্ত।
  - **মুমিন:** স্রষ্টা নির্ধারিত বিষয়সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে।
  - **মুসলিম:** স্রষ্টা নির্ধারিত কর্মসমূহ সম্পাদন করে।
  - **মুত্তাকী:** স্রষ্টার আদেশ নিষেধ সচেতনতা ও সতর্কতার সাথে পালন করে।
  - **মুহসীন:** স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য সবসময় স্বতঃস্ফুর্ত ও আন্তরিকভাবে কাজ করে।

জীবনের সকল বিষয়ে মুত্তাকী খুব সাবধানে পা ফেলে, সতর্কভাবে জীবন চালায়। ফলে তার গোটা জীবনই আল্লাহভীরুতার রংয়ে রঙিন হয়ে ওঠে।

মুসলমানদেরকে বিভিন্ন ইবাদত করতে হয়। যেমন, নামায, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি। এসব ইবাদতের একটা বাহ্যিক দিক থাকে যা প্রদর্শন করতে হয়, প্রকাশ করতে হয়। ইবাদত পালনকারীর ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তা অন্যদের দৃষ্টিতে আসে। এসব ইবাদতে মানুষের ভয় মানুষের সন্তুষ্টি বা সামাজিক উপকারিতার ব্যাপার জড়িত হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তির নামায লোক দেখানোর জন্য হতে পারে, যাকাত আদায়ে অন্যের সন্তুষ্টির সাথে নিজের সুবিধা আদায়ের সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। হজ্জকেও সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তির ধারণা প্রভাবিত করতে পারে। এমনকি জিহাদের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতেও দুনিয়াবী দৃষ্টিভঙ্গির সংশ্লিষ্টতা থাকা সম্ভব।

অন্যদিকে রোযার প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। রোযার কোন বাহ্যিক দিক নেই, রং ঢং নেই। রোযা দিয়ে কাউকে দেখানোর মত, সরাসরি কারও উপকার করার মত কিছু নেই। রোযা রেখে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ সরাসরি উদ্ধারের সামান্যতম সুযোগ নেই। রোযা এমন একটা ইবাদত যা কেবলমাত্র আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির জন্যেই রাখা হয়।

মুত্তাকী হতে হবে

কুরআনের হেদায়েত পাওয়ার জন্য

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে তিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে। তিনি আরো পরিস্কারভাবে বলেছেন যে কুরআনের হেদায়েত অর্জন করার জন্য মানুষকে অবশ্যই মুক্তাকী হতে হবে। কুরআনের হেদায়েত প্রাপ্তরা অবশ্যই সফল হয়। সুতরাং বলা যায়, জীবনে সফল হওয়ার জন্যেই মুত্তাকী হতে হবে।

সবধরনের ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য

এ পৃথিবীতে কত কিছুকেই মানুষ ভয় পায়। খালি চোখে দেখা যায়না এমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস থেকে শুরু করে দৃশ্যমান মশা, মাছি, সাপ, বিচ্ছু, বাঘ, ভালুক; অদৃশ্য জিনজাতি, ভূতসহ, চোর-ডাকাত, ছিনতাইকারী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ; মান সম্মান নষ্ট হওয়া, সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি অথবা সুযোগ-সুবিধা কমে যাওয়ার ভয়েও মানুষ ভীত থাকে। সব সময় ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের মধ্যে থাকলে কারও পক্ষে ভাল কিছু করা সম্ভব হয় না, কেউ ভাল থাকতে পারে না।

যখন কেউ আল্লাহকে ভয় করে না, শিক্ষা, যোগ্যতা ও দায়িত্ব এবং শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্বেও দুনিয়ার অনেককেই সে ভয় করে, তোয়াজ করে, হিসাব করে চলে। হুমকি ধমকি, আন্দোলন, হরতাল, ভাঙচুর ইত্যাদি সামাল দেয়। যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা এসব পরিস্থিতি সাহসের সাথে মোকাবিলা করে। ব্যক্তি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমাজের অন্যায়-অপকর্ম ঠেকাতে এগিয়ে আসে। তারা মৃত্যুকে ভয় পায় না, এমনকি কোন অন্যায় পার্থিব সুবিধা দিয়ে তাদের ঠেকানো যায় না। ইতিহাস সাক্ষী, মানব সমাজকে ক্ষতিগ্রস্থ করার উপসর্গগুলি নির্মূলে সব সময় আল্লাহভীরুরাই মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক শৃঙ্খলা ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় না করে, তাহলে সে আর অন্য কাউকে ভয় করে না। আইন-সালিশ, পুলিশ, কোন কিছুই সে পরোয়া করে না। কোন ভয়-ভীতি লজ্জা শরম থাকে না। এর ফলে সমাজের সর্বত্র অন্যায় বাড়াবাড়ি পাপ কোন রকম বাধা বিপত্তি

ছাড়া অগ্রসর হয়। আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভিকতা মানুষকে অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত করে। অন্যদিকে যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা নিয়মশৃংখলা, আইনকানুন ও বিধিবিধান আন্তরিকভাবে মান্য করে। সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

উন্নত জনশক্তি সৃষ্টির জন্যে

মুত্তাকীরা কাজের ব্যাপারে দায়িত্বের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট যোগ্যতা দক্ষতার অধিকারী। তারা সর্বাপেক্ষা ত্যাগ ও শ্রমের উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে। নিয়ম শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় এবং সময়মত কার্যসিদ্ধি করার ব্যাপারে তারা সর্বোচ্চ মানের প্রমাণ উপস্থাপন করে। পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের যে কোন অকল্যাণ ও অধঃপতন ঠেকাতে তারা বদ্ধপরিকর থাকে। মানুষ ও সম্পদ তাদের কাছে নিরাপদ ও সচল থাকে। মুত্তাকীরা চারিত্রিক গুণাবলীর বিষয়াদিতেও অত্যন্ত ব্যাপক উৎকর্ষতার প্রমাণ সৃষ্টি করে। মানব সমাজের উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য এ ধরনের সতর্ক সজাগ সক্রিয় সচেতন জনশক্তির কোন বিকল্প নেই।

রোযা মুত্তাকী বানায়

মায়ের কোলে সদ্য প্রসূত শিশুর কোন নিজস্ব ইচ্ছা শক্তি বা চাহিদা থাকে না। কিন্তু সে পরিপূর্ণ একটি সত্ত্বা। বাবা-মা আত্মীয়দের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। যেহেতু তার পছন্দ অপছন্দ নেই, সেজন্য তার কোন দোষও নেই, ক্রটিও নেই। সে পবিত্র, সুন্দর ও একেবারে স্বচ্ছ। সে সবাইকে আনন্দ দেয়, সবাই তাকে পছন্দ করে। শিশুটি যখন বড় হয় তখন বুঝতে শিখে। আস্তে আস্তে সে দেখে কোনটা তার জামা, প্লেট, খাট বা রুম। ধীরে ধীরে তার অজান্তে এসবের উপরে তার একটা অধিকার বা নিজস্বতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন সে তার কোন জিনিস কেউ ধরলে বলে ওঠে ওটা আমার। কোন কিছু না পেলে বলে আমার জিনিসটা কোথায় ইত্যাদি। সে যখন আরও বড় হয়, তার চাহিদাও ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়। এভাবে তার নিজের একটা জগত তৈরি হয়। যেখানে কারও অনুপ্রবেশ সে মেনে নিতে চায় না। এটাই আমিত্ব। সে তার নিজের চিন্তা চেতনার বাইরে আর কাউকে প্রশ্রয় দিতে রাজী হয় না। স্রষ্টাকেও না। তার এ নিজস্ব ইচ্ছা আকাঙ্খা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে আমিত্ব বা প্রবৃত্তি বলে। প্রবৃত্তির আরবী নাফস। এ ধরনের আমিত্ব মানুষের জন্য মহাসর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নাফসকে প্ররোচিত করেই শয়তান মানুষকে খারাপ কাজ করায়। রোযা নানাভাবে আমিত্বকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস অথবা অকার্যকর করে দেয়।

রোযা খাদ্য গ্রহণের আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণ করে

মানুষের প্রথম মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য। জীবন ধারণের জন্য যে শক্তি প্রয়োজন

তা সরবরাহ করে খাদ্য। খাদ্যের মৌলিক যোগানদাতা হলেন আল্লাহ। তিনি মানুষের জন্য অগণিত খাদ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন। নানা বর্ণের নানা স্বাদের হাজারো খাদ্য দ্রব্য তিনি আমাদের চারপাশে সরবরাহ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এসবের মধ্যে গুটিকয়েক বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন। খাদ্য অর্জনে বৈধ পন্থা বলে দিয়েছেন এবং খাদ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেছেন। অধীনস্তদের জন্য খাদ্য সরবরাহের উদ্যোগকে পুণ্য কাজ হিসাবে গণ্য করেছেন। যারা বিভিন্ন কারণে খাদ্য সংগ্রহে অপারগ হয়, তাদেরকে খাদ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। যে সব সৃষ্টি মানুষের নিয়ন্ত্রণে নয় সেসবের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক জীবের জন্য খাদ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ, খাদ্য গ্রহণ পরিচালন ও শক্তি যোগান পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছেন।

খাদ্য নিয়ে ঘটনা ও দুর্ঘটনার শেষ নেই। যদিও খাদ্যের ব্যাপারে শয়তানের কোন অবদান নেই, এমনকি একটিও খাদ্যদ্রব্য সে মানুষের জন্য তৈরি করেনি। তবুও খাদ্য নিয়ে সামান্য অসর্তকতা ও ক্ষণিকের প্রলুব্ধতার কারণে শয়তান অতি সহজেই অগণিত আদমকে আল্লাহদ্রোহী জাহান্নামী বানিয়ে ফেলে।

খাদ্যের ব্যাপারে শয়তানের কর্মনীতি হলো:

- আল্লাহ যে সব খাদ্য হারাম করেছেন, মানুষকে সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করা।
- হালাল বস্তু, কিন্তু উপার্জন পদ্ধতিতে ভেজাল ঢুকানো।
- খাদ্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের ব্যাপারে নিজস্ব কর্তৃত্ব নির্ধারণ।

রোযা সারাটা বছরের দিনের বেলা সবধরনের পানাহারের অভ্যাস পাল্টে দেয়। হালাল খাদ্য হাতের কাছেই আছে, ক্ষুধাও আছে, রোযা থাকার কারণে সেটা গ্রহণ করা হয় না। সকাল দুপুর রাত তিন বেলা খাদ্য গ্রহণ ছাড়াও দু চার বার হালকা খাবার গ্রহণের অভ্যাস, এমনকি মুখরোচক খুব পছন্দের খাদ্য গ্রহণের লোভও রোযা অত্যন্ত সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

রোযা হারাম খাদ্য গ্রহণ বা হারাম উপার্জিত অর্থ দ্বারা সংগৃহিত খাদ্য গ্রহণে সরাসরি বাধা প্রদান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে হালাল খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, সে কোনভাবেই আল্লাহর নিষিদ্ধ খাদ্য বা হারাম উপার্জনের দিকে নজর দিতে পারে না।

খাদ্যের পরিমাণ, প্রকৃতি ও খাদ্য গ্রহণে স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাপারেও রোযা নাফসের নির্দেশ অমান্য করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ পায় ক্ষুধার মাধ্যমে। ক্ষুধার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নাফস মানুষকে বেপরোয়া ও কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করায়। রোযার মাধ্যমে মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুধাকেও হজম করে স্বাভাবিক সুস্থ ও বিবেচনা প্রসূত আচরণ করে। ক্ষুধা থাকলেই খেতে হবে, যা ইচ্ছা তাই খেতে হবে, খাওয়ার জন্য প্রয়োজনে ন্যায় অন্যায় মানা যাবে না- নাফসের এ প্ররোচনা থেকে রোযাদার অত্যন্ত সফলভাবে বেঁচে থাকে।

রোযা আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণ করে

নাফসের প্রকৃতি বড় বিচিত্র। আলস্য, কর্মবিমুখতাসহ জীবনকে ধ্বংস করার সব ধরনের কার্যকারণকে তার খুব পছন্দ। মানুষকে আয়েশি জীবনে অভ্যস্ত করাতে পারলে তার সর্বনাশের জন্য এটাই যথেষ্ট। আরাম–আয়েশ ও বিলাস বৈভব অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয় ক্ষমতা, অর্থ ইত্যাদি। কারো অধীনস্ত থাকা অবস্থায় ইচ্ছামত আরাম আয়েশ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য নাফস মানুষকে সবার উপরে ওঠার প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেয়। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অন্যের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া ও ইচ্ছামত জীবনকে ভোগ করার অদম্য বাসনা একবার যদি কাউকে পেয়ে বসে তাহলে তাকে ফেরানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

রোযা রেখে কাজকর্ম ফেলে ঘরে বসে আরাম করা যায় না। বরং রোযা পালনকারীর কাজকর্মের পরিধি বিস্তৃত হয়। দিনের বেলা পানাহারের পিছনে সময় দিতে হয় না, এজন্য অন্যান্য কাজে তুলনামুলক বেশি সময় দেয়া যায়। চাকুরী ব্যবসা কৃষিকাজসহ যাবতীয় কার্যকলাপের সাথে সম্পর্ক রেখেই রোযা পালন করা হয়। রমযানে বিশেষ করে মহিলাদের পরিশ্রম কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এ সময়ে পূর্বের তুলনায় বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগী করতে হয়। তারাবিহ, তাহাজ্জুদ, ইফতার, সেহরী ইত্যাদির কারণে বছরের অন্য সময়ের তুলনায় ঘুম ও নিরবচ্ছিন্নভাবে শুয়ে বসে থাকার সুযোগ কম হয়। রোযা অত্যন্ত কার্যকরীভাবে নাফসের আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণ করে।

রোযা যৌন আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণ করে

যৌন কামনা জীবের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু লাগামহীন ও নিয়ম বহির্ভূত যৌন আচরণ মানব সভ্যতার উত্থানে সবচেয়ে বড় বাধা। অথচ নাফস এটারই পক্ষপাতি। সে যৌন সম্ভোগকে সীমাহীন করতে এবং সবধরণের নিয়ম শৃঙ্খলা মুক্ত রাখতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে সে বৈধ-অবৈধ প্রশ্ন তোলার বিপক্ষে। যৌন আকাঙ্খা পূরণে প্রয়োজনে সে মানুষ হত্যা পর্যন্ত করাতে পারে।

রোযা আমাদের এ জৈবিক চাহিদাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে নাফসের বাড়াবাড়ি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে।

অন্য সময়ের বৈধ যৌন সম্ভোগও রোযা দিনের বেলা অবৈধ করে দেয়। এসময়ে স্বামী/স্ত্রী সবধরনের সুযোগ ও আকাঙ্খা থাকার পরেও যৌন আচরণ থেকে বিরত থাকে। এখানে রোযা নাফসকে দারুণভাবে চপেটাঘাত করে। নাফস বলে, কেউ আমাকে এ সম্ভোগ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। রোযাদার বলে, রোযা অবস্থায় কেউই আমাকে এ কাজে লিপ্ত করাতে পারবে না। নিজের হালাল স্ত্রী/স্বামীকেও আল্লাহর ভয়ে রোযার কারণে ভোগ করা থেকে বিরত থাকতে শিখে। নাফস তাকে কোনভাবে অন্যের স্ত্রী/কন্যা/স্বামী/সন্তানের প্রতি অন্যায়ভাবে যৌন সম্ভোগে রাজি করাতে পারে না। রোযার দ্বারা এভাবে নাফসের

এ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রও রোযাদারের সম্পূর্ণ দখলে চলে আসে। সে আজীবন কেবল বৈধ সম্ভোগেই তৃপ্ত থাকে। যৌন চাহিদা মিটানোর জন্য সে কারও অধিকার হরণ করে না, কারও প্রতি নির্যাতন চালায় না, কাউকে অপমান করে না। বরং এ বিষয়ে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়ায়। অন্যের ইজ্জত আবরু রক্ষায় সে এগিয়ে আসে।

রোযা অন্যায় ও অবৈধ কাজ থেকে বিরত রাখে

ইসলামের অন্যান্য ইবাদত যেমন নামায, হজ্জ, যিকর, দান সাদকা ইত্যাদি পালন করেও মানুষ বিভিন্ন অপরাধ করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সে মনে করতে পারে, আমি এ খারাপ কাজটি করছি তাতে পাপ হচ্ছে, কিন্তু আমিতো ভাল কাজও করছি। তাতে আমার সওয়াব হচ্ছে। সুতরাং খুব একটা ক্ষতি কিছু হচ্ছে না। এতেতো আর আমার ইবাদতের কোন অসুবিধা নেই। সুতরাং মানুষ একদিকে পাপের কাজ করে, অন্যদিকে পুণ্যের কাজও চালিয়ে যায়। কিন্তু কোন ব্যক্তি যখন রোযা রাখে, তখন সে আর কোন খারাপ কাজ করে না। রোযা রেখে খারাপ কাজ করতে পারে না, তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। কেউ নামায পড়ে, আবার নামাযের বাইরে মিথ্যাও বলে। এ মিথ্যার জন্য কিন্তু নামায নষ্ট হয় না, কিন্তু তার আলাদা পাপ হয়। অথচ কোন রোযাদার মিথ্যা বললে তার রোযা রেখে কোন সওয়াব হয় না। সুতরাং কেউ যদি সত্যি রোযা রেখে আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করতে চায়, তাহলে তাকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকতে হয়। রোযা রেখে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিতর্ক দমন করতে হয়। রিয়া অহংকার সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হয়। অন্যায়ভাবে ধনসম্পদ ও ক্ষমতা হস্তগত করা এবং কারও ক্ষতি করা থেকেও বিরত থাকতে হয়। সুদ-ঘুষ, চোরাকারবারী, ওজন কমবেশী ইত্যাদিকে বলিষ্ঠভাবে প্রত্যাখান করতে হয়। স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা থেকে বেঁচে থাকতে হয়। এভাবে রোযা মানুষকে একটার পর একটা খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

রোযার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। রোযাই হল আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের সর্বোত্তম ব্যবহারিক প্রক্রিয়া। সে হিসাবেই রসূলুল্লাহ (স.) রোযাকে 'ঢাল স্বরূপ' আখ্যা দিয়েছেন।

রোযা বস্তুর আকর্ষণ কমায়

প্রাত্যহিক জীবনে মানুষকে শত সহস্র বস্তুর সংস্পর্শে আসতে হয়। সৃষ্টির সূচনালগ্নেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সকল বস্তুর নাম, এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ এবং এগুলি ব্যবহারের নিয়ম কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। বস্তুসমূহের মধ্যে কোনটা দামী, কোনটা কমদামী, কোনটা প্রয়োজন, কোনটা অপ্রয়োজন, কোনটা গ্রহণীয়, কোনটা পরিতাজ্য এটা জানেন কেবলমাত্র বস্তুসমূহের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ তায়ালা। মানুষ যদি এ ব্যাপারে নাক

গলাতে যায় তাহলেই সে ভুল করে। আল্লাহর শিখানো নিয়ম অনুযায়ী বস্তুর নাম বলে আদম (আ.) বেহেশতে ফেরেশতাদের সামনে সম্মানিত হয়েছিলেন। আবার আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু ব্যবহার করতে গিয়েই তিনি বিপদে পড়েছিলেন।

মানুষের শত্রু শয়তান বস্তুর নামই জানত না। কিন্তু সে আদম (আ.) কে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুর চাকচিক্য ও গুণাগুণ সম্বন্ধে ভুল তথ্য দিয়ে প্রলুব্ধ করেছিল। মানুষকে বিপথে নেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের মৌলিক কৌশল হলো মানুষ যেন নিজেকে বস্তুর ভাল-মন্দ নির্ধারণের মালিক মনে করে। সেজন্যে শয়তান অত্যন্ত সুকৌশলে মানুষের মধ্যে বস্তুগত অহংকার বসিয়ে দেয়। ফলে মানুষ তার বড়ত্বের প্রধান উৎস জ্ঞানকে বাদ দিয়ে বস্তু অর্জন ও ভোগের প্রতিযোগিতা করে, বস্তুগত অহংকারে গর্বিত হয়। বস্তুর চাকচিক্য ও আকর্ষণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। মানুষের মনে যখন বস্তুর প্রাধান্যের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন অতি সহজে তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা যায়।

শয়তান বস্তুর ভোগ দখলের ব্যাপারে মানুষকে বেপরোয়া হতে বলে। এ বিষয়ে কোন বিধি নিষেধ সে মানতে দিতে চায় না। কোন নিয়ম নীতির ধার ধারতে দেয় না। তার ইচ্ছা একদিকে বস্তুর গুণাগুণ ও উপকারীতা সম্বন্ধে মানুষ জ্ঞান অর্জন করবে, অন্যদিকে সে বেপরোয়াভাবে এসবের ভোগ দখল করবে। বরং বলা যায়, বস্তুকে কেবল পুরোপুরি ভোগ দখলের জন্যেই যা জানা দরকার তা জানবে, এর বেশি নয়। এটা হলো শয়তানি দর্শন। বস্তুর বেশি বেশি ভোগ উপভোগের জন্য যতটুকু জ্ঞান অর্জন করা দরকার এবং যা করা দরকার তাই করতে হবে। কোন নিয়ম কানুনের মধ্যে একে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না।সে চায় মানুষ একটা ক্ষুদ্র বস্তু নিয়ে মতভেদ করুক, ঝগড়া বাধুক, মারামারি বেধে যাক। এমনকি খুনাখুনি পর্যন্ত হোক।

আল্লাহ তায়ালা বস্তু সম্বন্ধে সীমাহীন জ্ঞান অর্জনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, কিন্তু বস্তুর ভোগের ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছেন। মানুষ কোন বস্তুকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা এজন্য নিয়ম কানুন ও বিধি নিষেধ বর্ণনা করেছেন।

রোযা বস্তুর প্রতি মানুষের এ মোহ কমিয়ে বস্তুগত অহংকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে।

রোযা আমাদের খাদ্য বস্তু, যৌনতা ও বিলাসী বস্তুর উপরে নির্ভরশীলতা কমায়। রোযার কারণে অতিরিক্ত ভোগের অভ্যাসে ছেদ পড়ে। রোযা প্রমাণ করে এতকিছু এত পরিমাণ না হলেও চলে।

রোযা বস্তুর প্রতি আসক্তি কমিয়ে জ্ঞানের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সারাদিন রোযা রেখে বস্তুর আকর্ষণ যখন শূন্যের কোঠায় আসে, তখন আমরা রাতে জ্ঞানের বাণী কুরআনের আয়াত তারাবিহতে গ্রহণ করি। রাতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় ফলে দিনে বস্তুর আকর্ষণ বাড়তে পারে না। এভাবে রোযা ও কুরআন বস্তুর আকর্ষণ কমিয়ে জ্ঞানের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা সবচেয়ে কম বস্তুগত সুবিধা ভোগ করে। তারা অতি সাদামাটা জীবন যাপন করে। তাদের বস্তুগত চাহিদা খুবই সীমাবদ্ধ। খাদ্য পোশাক পরিচ্ছদ আসবাবপত্র এমনকি বাসস্থান অফিস আদালত পর্যন্ত যতটুকু না হলেই না এরকম থাকে। অন্যদিকে নির্বোধ ও মূর্খদের বস্তুগত চাহিদার কোন শেষ নেই।

রোযা শিরক থেকে বাঁচায়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন, নিশ্চয়ই শিরক এক অতি বড় অবিচার বা অন্যায়। শিরক মানে শরিক বা অংশীদার স্থাপন বুঝায়। শিরক হলো আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য ও অধিকারে অন্য কাউকে অংশ দেয়া। মানুষ তার নির্বুদ্ধিতার কারণে অগণিত উৎসকে বিভিন্নভাবে আল্লাহর সাথে অংশীদার বানিয়ে ফেলে। এর মধ্যে খুবই সাধারণ কয়েকটি বিষয় হলো:

- ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করা।
- নবী রসূলগণকে আল্লাহর সন্তান বানানো।
- হযরত মরিয়মকে আল্লাহর স্ত্রী মনে করা।
- দেবদেবী ও বুজুর্গ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করা এবং তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করা, তাদের কাছে প্রার্থনা করা ইত্যাদি।
- নিজেকে বা অন্য কোন মানুষকে বা দল বা সংস্থাকে ব্যক্তি বা সামাজিক বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর মর্যাদা প্রদান করা।

এসবের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো সর্বশেষ বিষয়টি। অন্যগুলি বাইরে থেকে দেখা যায়, বুঝা যায়। কিন্তু যখন কোন মানুষ তার নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে সর্বময় কর্তৃত্বশীল মনে করে, তখন সেটা বাইরে থেকে বুঝা যায় না।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক বিষয়ের সাথে নিয়মিত সম্পর্ক রাখতে হয়, অগণিত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একজন মুমিন সব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করেন। যদি কেউ মনে করেন, তিনিও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার কিছু বলার নেই, তাহলে এটাই শিরক। এখানে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার বানায়। একইভাবে এ ক্ষমতা অন্য যে কাউকে দেয়া হোক না কেন তাকেই আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা হয়।

মানব মনের বড় সমস্যা হলো সে কাউকে মানতে চায় না। কারও কাছে ছোট হতে চায় না। মানুষ কখনও কারো অধীনতা স্বীকার করে না এবং সবাইকে সে নিজের অধীনে দেখতে চায়।

প্রধান কারণ হলো:

- আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহর ফিরিশতারাও আদমকে সিজদা করেছে।
- আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে সৃষ্টির সবকিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ সমস্ত কারণে গোটা সৃষ্টি জগতে মানুষের অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত।

অন্যের উপরে আধিপত্যের এ সুযোগ মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়। সে দেখে চারিদিকের সব কিছুই তার অধীন, তার নিয়ন্ত্রণে, তার খেদমতে। এক সময় সে ভাবে আমিই শ্রেষ্ঠ, আমার উপরে আর কেউ নেই।

মানুষের শত্রু শয়তান মানুষের এ অবস্থানের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মানুষকে অন্যের তুলনায় বড় ভাবতে উবুদ্ধ করে। কারন সে স্রষ্টার নির্দেশ অমান্যকারী। সে আদমের চেয়ে নিজেকে বড় মনে করেছিল এবং ভুলে গিয়েছিল আল্লাহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকর্তা ও মালিক।

অনেক সময় মানুষ আল্লাহকেও নিজেদের মত করে ভাবে। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী ও কর্মপদ্ধতিকে মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির মত সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিয়ে আসে। মানুষ তার চিন্তা চেতনা আন্দাজ অনুমান জ্ঞান অভিজ্ঞতার বাইরে অন্য কোন রকম অস্তিত্বের কথা ভাবতে পারে না।

আল্লাহর সঙ্গে শরিক করার ব্যাপারে মানুষের উপরে আরো এক ধরনের কার্যকরণ প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বিভিন্ন প্রয়োজনে তাকে অন্যের উপরে নির্ভর করতে হয়। এ নির্ভরতার অভ্যাস তাকে এক সময় তার মধ্যে হীনমন্যতা ও ক্ষুদ্রতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে। তার চেয়ে বড় তার থেকে এগিয়ে থাকা অনেককে সে বেশি মূল্যায়ন করে, অতিরিক্ত মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে সেগুলো তার মন-মগজে প্রভুত্বের আসন গেড়ে বসে।

রমযান কুরআনের মাধ্যমে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে শিরকের যাবতীয় উৎস, এর শাখা প্রশাখার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে। শিরক থেকে বাঁচার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। শিরককারীদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে।

রমযানের আগমনে মুসলিম সমাজে আল্লাহর বড়ত্বও আনুগত্য সম্বন্ধে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয়। চারপাশের অগনিত মানুষকে মহান মালিকের ইবাদতে পাগলপারা হতে দেখে দুর্বল চিত্তদের দৃষ্টি খুলে যাওয়ার সুযোগ হয়। তারা বুঝার সুযোগ পায়। প্রতিবছরই রমযান এ ধরনের লাখ-লাখ মানুষকে শিরকের অন্ধকার থেকে রক্ষা করে।

রমযানে রোযা পালনকারী খাদ্যের ব্যাপারে, যৌন কামনা পূরণে এবং আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার ব্যাপারে আল্লাহর বড়ত্বের কাছে অবনত হয়ে নিজেকে শিরকমুক্ত করে এবং জীবনের সকল ব্যাপার ও বিষয়াদিতে নিজস্ব অভ্যাস বা পারিবারিক, সামাজিক নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করে আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করে।

রোযা মানুষকে আল্লাহর উপরে নির্ভরশীল হতে সাহায্য করে

একজন মানুষ যখন কোন একটি বস্তু বিশেষ সময়ে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে বা মাত্রায় ব্যবহার করে অভ্যস্ত হয়, কোন কারণে সে বস্তু তার মত করে ব্যবহার করতে না পারলে সে অস্থির হয়ে পড়ে। তার মনে ভয় সৃষ্টি হয়, দুঃশ্চিন্তায় পড়ে। অনেক সময় রাগারাগি বাড়াবাড়িও করে।

রোযা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত সারাটা বছরের এ ধরনের অনেক মনগড়া নিয়মের বাইরে এসে বাঁচার প্রশিক্ষণ দেয়। নির্দিষ্ট করা নিয়ম পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন হলে যে সব উলোট পালট হয়ে যাবে, এমন নয়, রোযা এটা সুন্দরভাবে প্রমাণ করে। যে ডায়েবেটিস রোগী সকাল ১১ টায় কিছু খেতে ২-৪ মিনিট বিলম্ব হলে হাইপোতে যাওয়ার ভয়ে ভীত থাকে, রোযার বিনিময়ে সে আরও ৮ ঘন্টা কিছু না খেয়ে দিব্বি কাটিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে না খেয়েও বাঁচার এক নুতন স্বাদ আস্বাদন করে। কোন খাদ্য, কোন সময়, বা পরিমাণের উপরে যে নির্ভরশীলতা লোপ পায়। আল্লাহর উপরে নির্ভর করে জীবনকে সুন্দর ও সফল করার ব্যাপারে এক অভিনব পথের সন্ধান পাওয়া যায়। রোযার মাধ্যমে অর্জিত আল্লাহর প্রতি এ নির্ভরশীলতা প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি বিষয়ে প্রয়োগ করে অন্য সব কৃত্রিম ও অস্থায়ী নির্ভরতা উপেক্ষা করে সীমাহীন সাফল্যের পথে আগানো সম্ভব হয়।

রোযা সামাজিক সমতা স্থাপনে সাহায্য করে

দরিদ্র অভাবী মানুষেরা সারাবছরই খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করে। অন্যদিকে ধনী মানুষের খাদ্যের অভাব না থাকায় কখনো ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করে না। রমযান মাসে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজের সবাই রোযা পালনের মাধ্যমে ক্ষুধার স্বাদ আস্বাদন করে। এ সমতা মনমানসিকতা আচার আচরণ ও কাজকর্মের ভিতরেও এক ধরনের সাম্য ও একতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয় নিঃসন্দেহে।

রোযা পালনের মাধ্যমে এভাবে যখন কোন ব্যক্তি তার নাফসকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করে তখন সে এক পরিচ্ছন্ন পবিত্র খোদাভীরু ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তার দেহ ও মন-মস্তিষ্ক সবধরনের অশুচিকর অন্যায় কর্মকান্ড ও চিন্তা চেতনা থেকে মুক্ত হয়। তার ভিতরের কালিমা ও অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে দূর করে। সে হয়ে ওঠে সত্য ও ন্যায়ের উজ্জ্বল নমুনা। কল্যাণ ও প্রেমের সুস্পষ্ট প্রমাণ। সেই হলো মুত্তাকী। আল্লাহর ভয় ও ভালবাসাতেই যার সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। এ ধরনের এক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র দেহ-মনের ভিতরেই প্রবেশ করতে পারে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মহাপবিত্র বাণী। কুরআনের সুস্পষ্ট ও কল্যাণকর বিধি-নিষেধ গ্রহণ ও পালন করার ক্ষমতা সে অর্জন করে।

এ লক্ষ্যেই সে রাতের তারাবিহতে, তাহাজ্জুদে যখন কুরআন শোনে, কুরআন তখন তার রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে কোষের কণায় কণায় মন ও মগজের পরতে পরতে ঢুকতে থাকে। তার চিন্তা চেতনায় নাফসের যে আবরণ ছিল তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। নতুন ধারণা তত্ত্ব

ও তথ্য দিয়ে সেটিকে ভর্তি করে দেয়। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে আস্বাদন করে মহান প্রতিপালকের সুমধুর ঐশী বাণীর পরশ। খুশিতে ভরে যায় প্রাণ, আনন্দে নেচে ওঠে মন। পবিত্র দেহ মন ও চিন্তা চেতনা সমৃদ্ধ এ মানুষটি হয়ে ওঠে আল্লাহর খলিফা। স্বতস্ফুর্তভাবে ধন্যবাদ জানায় মহান প্রভুকে "সকল প্রশংসা আপনার হে আমার প্রভু - গোটা বিশ্বজাহানের মালিক।"

রোযা সেহরী ও ইফতার

আল্লাহ তায়ালা রোযার সাথে সেহরী ও ইফতারকে সম্পৃক্ত করেছেন। মূলতঃ সেহরী-ইফতারীই রোযার একমাত্র বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা। রোযা শুরু হয় সেহরী দিয়ে এবং শেষ হয় ইফতার দিয়ে।

রসূলুল্লাহ (স.) সেহরী ও ইফতারকে রোযাদারের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি (স.) আরোও বলেছেন, রোযার ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমদের পার্থক্য হলো সেহরী। সেহরী ও ইফতারের মাধ্যমে রোযাকে অতি প্রাকৃতিক কষ্টকর ইবাদতের অবস্থা থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

ইফতার যেমন সন্ধ্যাকালীন নাস্তা নয়, একইভাবে সেহরীও রাত্রিকালীন খাদ্য গ্রহণ নয়। কেউ যদি পরের দিন রোযা পালনের উদ্দেশ্যে রাতের শেষ দিকে কোন পানাহার করে তাহলেই সেটাকে সেহরী বলা হয়। অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজনে সেহরীর সময় খাদ্য গ্রহণকে সেহরী বলা হয় না।

ইফতারীর আনন্দ এজন্য নয় যে রোযাদার সারাদিন রোযা রেখে কষ্ট পেয়েছে, ইফতার খেয়ে তার কষ্ট দূর করছে। প্রকৃত রোযাদারের নিকট ইফতারীর খাদ্য এর গুণাগুণ বা পরিমাণের কোন গুরুত্ব নেই। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল, মনিবের নির্দ্ধারিত হুকুম সময়মত পালন করার জন্য। সেটা সে করেছে, তাই সে খুবই আনন্দিত। একজন সত্যিকার গোলাম মনিবের হুকুম পালন করে যেমন আনন্দিত হয়।

সফল রোযার জন্য করণীয়

- ♦ প্রত্যেকটি রোযা পালন করার জন্য পাকা নিয়ত ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।
  - ইতিপুর্বে রোযা পালনে কোন অবহেলা বা গাফলতি হয়ে থাকলে সেগুলির ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হোন।
  - শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করার জন্য রোযা রাখুন। আর অন্য কোন উদ্দেশ্যে যেন না থাকে। যেমন-
    - বাবা, মা বা অন্য কাউকে খুশি করার জন্য।
    - সামাজিকতা বা পারিবারিক কৃষ্টি রক্ষার জন্য।
    - ছোটবেলা থেকে রোযা রাখার অভ্যাসের জন্য।
    - সামাজিক লজ্জা বা অপমানের ভয়ে।
    - চিকিৎসা স্বাস্থ্যগত সুবিধা বা অন্য কোন সুবিধা লাভের জন্য।

- রোযার তাৎপর্য, গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করুন।
- রোযা রাখার প্রকৃত কারণ ভালভাবে বুঝে নিন।
- শারীরিকভাবে সুস্থ সবল থাকার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- অসুস্থতা থাকলে উপযুক্ত চিকিৎসা নিন এবং রমযানে যেন সমস্যা না বাড়ে সে ব্যাপারে সম্ভাব্য সবকিছু করুন।
    - একজন ভাল মুসলিম চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন এবং তাঁর পরামর্শ মেনে চলুন।
- একান্ত জরুরী না হলে সফর/ ভ্রমণ এর পরিকল্পনা বাদ দিন।
    - গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে সফর করতে বাধ্য হলে সফরসূচি সুবিধামত পুনঃনির্ধারণ করুন।
    - বড় ধরনের এবং ঝুঁকিপূর্ণ শারীরিক পরিশ্রমের বিষয়গুলি সম্ভব হলে এড়িয়ে চলুন।
- সবধরনের স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ক্ষতিকারক অনিয়মসমূহ পরিহার করুন।
- রোযা রাখার নিয়মকানুন ও মাসয়ালা-মাসায়েল জেনে নিন।
    - ভালভাবে জানা থাকলেও রিভিশন করুন।
- আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে নিয়মিত সুন্দরভাবে ভাল রোযা রাখার তৌফিক চেয়ে দুআ করুন।
- সবধরনের নিষিদ্ধ কাজ বন্ধ করুন এবং অন্যায় বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হোন।
- ব্যক্তিগত বদঅভ্যাস দ্বারা যে সমস্ত পাপ সংগঠিত হয় সেগুলো চিহ্নিত করে তা থেকে দূরে থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। নিজে বুঝতে না পারলে কোন বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শ নিন।
- খাদ্যের ব্যাপারে সতর্ক হোন।
    - হালাল খাদ্য গ্রহণ করুন এবং সর্বাত্মকভাবে হারাম খাদ্য বর্জন করুন।
- সব ধরনের অবৈধ যৌন আচরণ পরিত্যাগ করুন।
- দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করুন ও পর্দা মেনে চলুন।
- অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকুন।
- মিথ্যা কথা বলা পরিত্যাগ করুন।
- রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- পরনিন্দা বা গীবত বন্ধ করুন।
- দৈনন্দিন কাজকর্মে কোন পাপ না ঘটে সেজন্য অনেক বেশি সতর্ক থাকুন।
- লেন-দেন, কথা-বার্তা, বক্তৃতা, লেখা, কেনা-বেচা ইত্যাদিতে যে কোন অন্যায় অনিয়ম পরিহার করুন।
- অহংকার, হিংসা, অতিলোভ, ওয়াদা ভঙ্গ করা, আমানতের খেয়ানত করা, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, মানুষের ক্ষতি করা, অবৈধ উপার্জন, অপব্যয়-অপচয়, ঝগড়া/ তর্ক-বিতর্ক, মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার, প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের প্রতি অবহেলা এবং ইসলামের জন্য ক্ষতিকারক যে কোন কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্টতা, খোদাদ্রোহী অবিশ্বাসী কাফের মুনাফিক ও মুশরিকদের সাথে সখ্যতা ইত্যাদি ছেড়ে দিন।

- মহিলাদের প্রাকৃতিক কারণে যে সব রোযা বাদ পড়বে সেগুলি হিসাব করে গণনা করে রাখুন এবং পরবর্তীতে সেগুলি গুণে গুণে সঠিকভাবে পালনের নিয়ত রাখুন।
- দাদা-দাদী বা মা-বাবাসহ বৃদ্ধ ও বয়স্ক এবং অসুস্থ কেউ রোযা পালনে অক্ষম হলে তাদের প্রত্যেক রোযার জন্য ফিদিয়া প্রদান করুন।
- অন্যদেরকে রোযা পালনে সাহায্য ও উৎসাহিত করুন। শুরু করুন নিজ পরিবার থেকে এবং আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, প্রতিবেশীদেরকে রোযা রাখার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করুন।

ইফতার ও সেহরীর করণীয়

- সময় হওয়া মাত্র ইফতার করুন, অযথা বিলম্ব করবেন না।
- ইফতার ও সেহরীতে খাদ্য নিয়ে কোন রকম বাড়াবাড়ি করবেন না। রোযা ভাঙ্গার জন্য ইফতারীতে কোন খাদ্য থাকা অত্যাবশ্যক নয়। রোযা ভাঙ্গার নিয়ত করলেই রোযা শেষ হয়ে যাবে। শুধু পানি দিয়েও ইফতার করা যায়।
- ইফতারের ব্যাপারে অযৌক্তিক অস্থিরতা ও হৈ চৈ করা থেকে বিরত থাকুন।
- ইফতারের সময় প্রায়ই সাধ্য অনুযায়ী মেহমান রাখার চেষ্টো করুন।
- আসরের নামাজের পূর্বেই ইফতারের আয়োজন শেষ করুন।
- ইফতারের পূর্বে দুআ করুন।
- ইফতার আয়োজনে বেশি ব্যস্ত থাকায় মহিলারা দুআ করতে পারেন না। এ অবস্থা পরিবর্তন করুন।
- ইফতারের সময় হঠাৎ কেউ উপস্থিত হলে বিরক্ত হবেন না।
- ইফতারের শুরু ও শেষে রসূল (স) এর শিখানো দুআ পাঠ করুন।
- সাদামাটা বা সাধারণ মানের খাদ্য দ্রব্য দিয়ে মেহমানকে ইফতার করাতে লজ্জাবোধ করবেন না।
- ইফতারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকুন। নিজেও ইফতারের আয়োজন করুন। সুন্দর অনুষ্ঠানসূচী তৈরি করুন। সেখানে দুআর ব্যবস্থা রাখুন। খাদ্যের ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে রমযান রোযা সম্পর্কিত আলোচনার দিকে গুরুত্ব দিন।
- ইফতার ও সেহরীর খাদ্য তালিকা সুষম ও সাদামাটা রাখার চেষ্টা করুন।
- প্রতিদিন সেহরী খাওয়ার অভ্যাস করুন।
- সেহরী শেষে রোযা রাখার নিয়ত করুন।
- ইফতার করার সময় নিম্নোক্ত দুআ করা সুন্নাহ
  - **আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া 'আলা রিযকিকা আফতারতু।**
    হে আল্লাহ! আমি আপনারই জন্যে রোযা রেখেছি এবং আপনারই রিযিক দ্বারা ইফতার করছি। (আবূ দাঊদ)
  - **যাহাবায যিমাউ, ওয়াব তাল্লাতিল উরুকু, ওয়া ছাবাতাল আজরু ইন শা আল্লাহ।**
    তৃষ্ণা বিদূরিত হয়েছে এবং শিরাগুলো সতেজ হয়ে উঠেছে, আর আল্লাহ চাহেন তো সওয়াব ও পুরষ্কার স্থির হয়ে গেছে। (আবূ দাঊদ)

রমযান মাস রহমত অর্জনের মাস

দয়া ও অনুগ্রহের কাঙ্গাল মানুষ কত কিছুর কাছে কৃপা ও সহযোগিতার জন্য তাকে হাত পাততে হয়। আলো বাতাস পানি, খাদ্য বস্ত্র চিকিৎসা বাসস্থান, কর্মসংস্থান সবকিছুতে তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। সব সময় তাকে কারো না কারো অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কার কাছে কতটুকু পাবে সেটা পর্যন্ত সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

মহান স্রষ্টাই হলেন সকল দয়া ও করুণার আধার। গোটা বিশ্বজাহানের সর্বত্র বিরাজমান সব ধরনের মায়া মমতা প্রেম ভালবাসা আসক্তি অনুগ্রহের উৎস হলেন আল্লাহ তায়ালা। মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সফল করার জন্য আল্লাহর রহমতের কোন বিকল্প নেই। তাঁর অনুগ্রহ দয়া কৃপা ব্যতীত কোন ব্যাপারেই মানুষ কল্যাণ লাভ করতে পারে না। মানুষের জীবন এবং জগতের সবকিছু আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমতের নমুনা। আল্লাহর রহমতেই সে জীবন পায়। তাঁর রহমতেই সে বেঁচে থাকে, বড় হয়।

আল্লাহর রহমত ও দয়ার কারণে চলাচল করে বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি। আমরা পাই আলো আঁধার, ঋতুর বৈচিত্র্য, জীব বৈচিত্র্য, খাদ্য পানীয়। তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন হয়ে অবস্থান করে আকাশ, পাহাড়, নদী সাগর বৃক্ষলতা। মানুষ যখন আল্লাহর রহমত অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, তখন এসব কিছু থেকে সে কল্যাণ পায়। তার জীবন আনন্দে ভরে ওঠে।

সন্তানের জন্য মাতা-পিতার স্নেহ, ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকের যত্ন, ছোটদের ব্যাপারে বড়দের আদর-সোহাগ, জনগনের জন্য শাসকের দয়ামায়া সবকিছু আসে আল্লাহর রহমত হিসাবে। মানুষ যখন আল্লাহর রহমত ধারণ করে তখন তার ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের সকল ক্ষেত্র দয়া মমতা স্নেহ ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।

কোন মানুষের কাছেই কারও সারাজীবন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে রহমত পাওয়ার প্রয়োজন কোন মানুষের কখনও শেষ হয় না। এমন কখনও হয় না যে আল্লাহর কাছ থেকে যা পাওয়ার পেয়ে গেছি, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। বরং সামনের দিনগুলিতে তাঁর আরও বেশি সাহায্যের দরকার হয়। আমৃত্যু প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাঁর সাহায্য ও করুণা প্রয়োজন। মৃত্যুর পরে আর কেউ যখন আমাদের উপকার করতে পারবেনা, কবরে এবং হাশরে তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। পাগল এবং চরম হঠকারী কাফের মুশরিক ছাড়া কেউ আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণার প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারে না।

মানুষ কোনদিন কোনভাবে শয়তানের কোন ক্ষতি না করা সত্বেও পাপিষ্ঠ শয়তান খুব নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার রহমতের নিবিড় সংস্পর্শ থেকে বিছিন্ন করার প্রাণপন

চেষ্টা চালায়। এ লক্ষ্য অর্জনে শয়তান মানুষকে দ্রুত স্বনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষ যেন কারো ধার না ধারে, কারো জন্য অপেক্ষা না করে, কারো দিকে তাকিয়ে বসে না থাকে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তির প্রতিযোগিতায় ক্রমান্বয়ে মানুষ স্রষ্টার ব্যাপারেও ধার না ধারার পর্যায়ে চলে আসে। শিক্ষিত সম্পদশালী ও ক্ষমতাবানদের বৃহত্তর অংশ নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবতে শুরু করে।

যেখানে স্রষ্টা থাকেনা, সেখানে দয়া ও করুণা থাকে না। স্রষ্টা অবিশ্বাসী মানুষ সেজন্য কর্কশ নির্দয় ও নিষ্ঠুর হয়। আল্লাহর রহমত থেকে বিচ্ছিন্নতার পরিণতিতে শিশু হারায় পিতামাতার স্নেহ, শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয় শিক্ষকের আদর-যত্ন, বড়দের কাছে থাকে না ছোটদের জন্য কোন দয়ামায়া, শাসকরা দেখে না জনগনের স্বার্থ ইত্যাদি। এভাবে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে ভালবাসাহীন যান্ত্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থায়। আল্লাহর রহমত না থাকলে বায়ু চলাচল রোদ-বৃষ্টি, ঋতুর বৈচিত্র্য, খাদ্য-পানীয়, জীববৈচিত্র্য, আকাশ-পাহাড়, নদী-সাগর, বৃক্ষলতা, ফসলাদি, চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা কিছুই ঠিক থাকেনা। সবই কঠিন নিরানন্দ হয়ে যায়, নিষ্ঠুর আক্রোশে ফেটে পড়ে মানুষের উপর।

মানুষের প্রতি অতীব দয়া পরবশ মালিক আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ অসহায়ত্ব থেকে উদ্ধার করতে চান। তার থেমে যাওয়া জীবনকে আবারো তাঁর রহমতের পরশে চলমান করতে চান। বিগত সময়ে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সব ছাপিয়ে উপচে পড়া রহমত দিয়ে মানুষকে ধন্য করতে চান। সে জন্যই তিনি নির্ধারণ করেছেন রমযান নামে বছরের একটি মাস। সব ভাল উদ্যোগের প্রতিদান সত্তর গুণ। এক ধাক্কায় সারা বছরের ক্ষয় ক্ষতির সব সূচক ছাপিয়ে লাভের সূচক উর্ধ্বগতি।

মানুষের জীবনে সুস্থ সবল ও সক্ষম থাকা, সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচা, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান নিয়ে সমস্যা না হওয়া, জীবন জীবিকা ও সম্পদের নিরাপত্তা ও অগ্রগতি, পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি সৌজন্য ও সখ্যতা বৃদ্ধি, রুজি-রোজগারে বরকত ও সমৃদ্ধি সবকিছু একান্তভাবে নির্ভর করে আল্লাহর রহমতের উপরে। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই এগুলি কামনা করে।

মুসলিমগণ আরও বিশেষ কিছু অনুগ্রহ যেমন- ঈমান ও আমল বৃদ্ধি, আখলাক-চরিত্রের উন্নতি, ঈমান ইসলাম ও তাকওয়ার উপরে মৃত্যু, কবরের শাস্তি থেকে বাঁচা, হাশরের মাঠের আযাব গজব অপমান লঞ্ছনা থেকে মুক্তি, দোযখ থেকে মুক্তি ও জান্নাত পাওয়ার জন্যে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

রমযান এগুলিসহ সকল চাহিদা পূরণে আল্লাহ তায়ালার রহমত নিয়ে আসে। যে ব্যক্তি রমযান মাসে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ভাল থাকার জন্য সারাটা বছরের অনুগ্রহ দয়া ও কৃপা আমরা রমযান থেকে সংগ্রহ করতে পারি।

আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই তাঁর সৃষ্টির প্রতি করুণা বর্ষণ করেন। বছরের অন্যান্য সময়ে কিছু কিছু বিশেষ সময়ে তিনি বিশেষভাবে তাঁর অতিরিক্ত করুণা দান করেন। যেমন সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে জুম্মার দিন। রমযান মাসে তিনি সর্বোচ্চ দয়া ও অনুগ্রহ প্রেরণ করেন। গোটা সৃষ্টি জগতে রমযান মাসে তাঁর রহমতের বন্যা বয়ে যায়। কেউই তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা নয়। রমযান হলো মহান আল্লাহর রহমত ঝরার মাস।

রহমত প্রাপ্তির জন্য করণীয়

- আপনার অস্তিত্বের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য সুখী ও সফল হওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য ও দয়া অতীব প্রয়োজন, এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও স্বীকার করুন।
- ইতিমধ্যে আপনার প্রতি আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহের কথা আন্তরিকভাবে স্মরণ করুন। অবিস্মরণীয় বিষয়গুলির তালিকা করুন।
- তাঁর প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন। আরও দয়া ও করুণা প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করুন।
- কুরআন আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। কুরআনকে শক্ত হাতে ধারণ করুন। মহান আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর অপার করুণার উৎস হিসাবে কুরআনের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, মুমিনদের জন্য কুরআনে রয়েছে যাবতীয় রোগমুক্তি ও রহমত।
- আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ (স.) কে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য মুহাম্মাদ (স.) কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে বিবেচনা করুন। তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য বৃদ্ধি করুন। এটা সুনিশ্চিত যে মুহাম্মাদ (স.) এর দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতির বিরোধিতা করে কখনও আল্লাহর রহমত পাওয়া যাবে না।
- মানুষের প্রতি ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। মানুষকে ভালবাসুন, কোনভাবেই মানুষের ক্ষতি করবেন না। আপনি আল্লাহর কাছে যে অনুগ্রহ আশা করেন, মানুষ আপনার কাছে তার চেয়ে অনেক কম অনুগ্রহ চায়। মানুষের এ অতি সামান্য প্রত্যাশা পূরণ না করে আপনি আল্লাহর কাছে নিজের জন্য বড় বড় অনুগ্রহ কামনা করে সফল হতে পারবেন না।
- অধীনস্তদের জন্য কাজ সহজ করুন। তাদের সাফল্যে সাহায্য করুন।
- উপকারীর উপকারের কথা স্মরণ রাখুন। তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন। কোনভাবে অকৃতজ্ঞ হবেন না।

রমযান মাস মাগফিরাত অর্জনের মাস

উন্নতির অপার সম্ভাবনার পাশাপাশি মানুষের রয়েছে সীমাহীন অপারগতা, দুর্বলতা ও অযোগ্যতা। তার শক্তি ক্ষমতা বুদ্ধি বিবেচনা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা ব্যাপক। তার ভুল ভ্রান্তি হয়, সে অপরাধ করে। শাস্তির যোগ্য হয়। আল্লাহর ক্ষমা ব্যতীত মানুষের বাঁচার উপায় নেই।

- ক্ষমা মানুষকে মুক্তি দেয়, শাস্তি থেকে বাঁচায়।
- ক্ষমা মানুষকে সংশোধনের সুযোগ দেয়, ফিরে আসার ব্যবস্থা করে।
- ক্ষমা মানুষকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে।

আদম ও হাওয়া (আ.) বেহেশতে শয়তানের প্ররোচনায় ভুল করে আল্লাহর নিষেধ লংঘন করার পর ভুল স্বীকার করেছিলেন। এবং মহান প্রতিপালক তাঁদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়াকে ইসলাম খুবই উৎসাহিত করে।

অন্যদিকে ভুল স্বীকার না করা শয়তানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে আদমকে (আ.) সিজদা না করার জন্যে ভুল স্বীকার করেনি। বরং উল্টা যুক্তি দিয়ে নিজেকে নির্ভুল দাবী করেছে। ভুল করার চেয়ে তা অস্বীকার করা এবং অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো অনেক বেশি বাড়াবাড়ি। শয়তান মানুষকে ভুল করায় এবং মানুষ যেন কোন ভাবেই ভুল স্বীকার না করে, সে জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছু করে।

আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করার নানা আয়োজন করেন। অনেক দোষ-ত্রুটি আল্লাহ ভ্রুক্ষেপ করেন না, ধরেন না। অনেক ভুল-ভ্রান্তি এমনিই তিনি মাফ করে দেন। অনেক সময় ভাল কাজের মাধ্যমেও আমাদের প্রচুর গুনাহ মাফ করেন। নামাযের মাধ্যমে নিয়মিত ভুল-ভ্রান্তি থেকে মাফ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। সাপ্তাহিক শুক্রবারে আমাদের অনেক গুনাহ মার্জনা করেন। সর্বোপরি রমযানের মাধ্যমে বিগত এক বছরের গুনাহ মাফের ব্যবস্থা করেন।

রমযান সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমান ও ইহতিসাবসহ রোযা পালন করবে এবং রাত্রিতে কিয়াম করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জীবনের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন এবং সে ঈদের দিন সকালে সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে।

রসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন, রমযান মাস পাওয়ার পরেও যদি কোন ব্যক্তি তার গুনাহ মাফ করে নিতে না পারে, সে খুবই হতভাগা। তার উপরে আল্লাহর অভিশাপ, জিবরাইলের (আ.) অভিশাপ এবং আমার অভিশাপ।

ক্ষমা পাওয়ার জন্য শর্ত হলো- ভুল স্বীকার করে মাফ চাওয়া এবং ভবিষ্যতে সে ভুল আর না করার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি প্রদান।

ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য করণীয়

- অত্যন্ত ক্ষমাশীল আল্লাহ্ ছাড়া পাপ মোচন করার কেউ নেই দৃঢ়ভাবে মনে প্রাণে তা বিশ্বাস করুন।
- নিজেকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করবেন না।
- জীবনের সকল পাপের কথা মনে করে ক্ষমা চেয়ে নিন তালিকা তৈরি করে।
- অকাতরে ভুল স্বীকার করুন।
- ইচ্ছাকৃতভাবে এসব গুনাহ্ আর না করার প্রতিজ্ঞা করুন।
- নিঃশর্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।
- কোন ব্যক্তির কাছে অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিন।
- আল্লাহ্‌র ক্ষমা অর্জন করতে হলে অন্যদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি যদি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কৃত সীমাহীন পাপের জন্য ক্ষমা পেতে চান, তাহলে আপনার কাছেও যদি কোন ব্যক্তি অন্যায় করে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিন। মনে রাখবেন, আপনার কাছে কৃত কোন ব্যক্তির অপরাধের সংখ্যা ও গভীরতা আল্লাহ্‌র কাছে কৃত আপনার অপরাধের সংখ্যা ও গভীরতার তুলনায় অতি তুচ্ছ। আপনি যদি তাকে ক্ষমা করতে না পারেন, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে আপনি আপনার সীমাহীন অপরাধের ক্ষমা আশা করতে পারেন না।
- পরিবারের সদস্য, সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন আপনার কাছে অপরাধ করলে তাকে দেখে নেওয়া ও পরকালে শাস্তির জন্য হুঁশিয়ার করবেন না। তাকে ক্ষমা করুন। আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আগেই।
- নিজের ভুলের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাবেন না।
- কেউ ভুল ধরলে বিরক্ত হবেন না, রাগ করবেন না।
- আপনার সমালোচনাকে ভুল সংশোধনের সুযোগ মনে করুন।
- পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেন নির্দ্বিধায় পরস্পরের ভুল ধরে দিতে পারে, এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখুন।
- ক্ষমা করাকে বোকামী ও দুর্বলতা মনে করবেন না।
- ক্ষমা চাওয়াতে নিজেকে ছোট ভাববেন না।
- মানুষের গুণাবলী ও যোগ্যতার কথা বিশ্বাস করে তা প্রচার করুন।
- মানুষের দোষ, ভুল সহজে বিশ্বাস করবেন না এবং প্রচার করবেন না।

রমযান মাস দোযখ থেকে মুক্তির মাস

উৎপাদক পণ্য তৈরি করে বাজারজাত করে। মানসম্মত পণ্যই বাজার পায়, প্রতিষ্ঠান লাভবান হয় এবং সুনাম অর্জন করে। মানহীন পণ্য বাজার পায় না। ফলে উৎপাদনের সাথে জড়িত সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর আনুগত্য করার জন্যে। যারা তাঁর কথা অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করেন। জান্নাত দান করেন। সেখানে তারা চিরকাল সুখ ও শান্তির মধ্যে বসবাস করে। যারা তাঁর কথা অমান্য করে, তাদেরকে তিনি শাস্তি দেন, চিরকাল অশান্তি ও দুঃখ কষ্টের স্থান জাহান্নামে রাখেন।

আল্লাহ বিমুখতার কারণে মানুষ প্রতিনিয়ত জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হয়। মানুষের অবস্থা হলো ঐ কলমের মত যা কেনা হয়েছে কিন্তু মোটেও লিখে না। যতই ঘষামাজা করেন কাজ হয় না। এটা বিরক্তিকর, হাতে নিলেই মেজাজ খারাপ হয়। লিখতে গেলে লিখে না, পকেটে রাখলে কালি বের হয়ে কাপড় নষ্ট করে। এটা আসলে ফেলেই দেয়ার মত। এ ধরনের অনুপযুক্ত অধম মানুষদেরকে যেখানে ফেলা হবে তার নামই জাহান্নাম।

আল্লাহ তায়ালার অবস্থান কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানের মালিকের মত নয়। তাঁর রাজত্বের কোন সীমা নেই। উৎপাদিত পণ্যের কোন সংখ্যা নেই। দু চার পাঁচ দশ হাজার পণ্য অকেজো হওয়াতে তাঁর কিছু আসে যায় না। কিন্তু অসীম দয়ালু আল্লাহ অকেজো পণ্যগুলিকেও কর্মক্ষম করার জন্য বাজারে ফিরে আসার ব্যবস্থা করেন। রমযান সে ধরনেরই একটি সুযোগ হিসাবে প্রতি বছর অগণিত পাপীকে জাহান্নাম থেকে বাঁচায়।

রমযানে দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। কোন দেশের সরকার সারা বছর ধরে নানা উপলক্ষে ২-৪ জন আসামিকে ছেড়ে দেয়। দাগী আসামিরা এসব সুযোগে ছাড়া পায় না। তারা বড় কোন ছাড়ের অপেক্ষায় থাকে। বিজয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সরকার যখন বিশেষ অনুগ্রহে অগণিত আসামীকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়, তখন তাদের মনে আশার সঞ্চার হয়। একটু খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করে, দৌড়-ঝাঁপ করে। আগের তুলনায় একটু সাবধান সর্তক হয়, চলাফেরা আচার আচরণ ভাল করে, জেলের অফিসারদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে। সে জানে, এধরনের বড় সুযোগ বছরে বার বার আসে না। এটাতেও বের হতে না পারলে আরও অনেক দিন জেলের ভাত খেতে হবে, অনেক ভোগান্তি হবে। সুতরাং সে মরিয়া হয়ে ওঠে মুক্তির আশায়। যদি সে উপলক্ষে তার নাম না আসে, তাহলে সে নিজেকে চরম হতভাগা ভাবে। মানসিকভাবে প্রচন্ড আঘাত পায়, ভেঙে পড়ে। তার ঘনিষ্ঠজনেরাও তাকে গালাগালি করে হতভাগা ভাবে, হতাশ ও বিরক্ত হয়। এতে তার হুঁশ হলেও ততক্ষণে সুযোগ চলে যায়। দীর্ঘ এক বছরের আগে তার মুক্তির আর কোন সম্ভবনা থাকে না।

অপরাধ ও অযোগ্যতার বিচারে আমরাও বড় দাগী আসামী। ছোটখাট ছিঁচকে চোর নয়। মানব হত্যা, সন্ত্রাস, দেশদ্রোহীতার মত বড় বড় অপরাধ। প্রচলিত আইনে এ সবের যে কোন একটা অপরাধেই কমপক্ষে যাবজ্জীবন কারাভোগ করার কথা। অথচ আল্লাহর আনুগত্যের প্রশ্নে আমরা প্রত্যেকে অসংখ্য বড় বড় অপরাধে অপরাধী। রমযানের আগমন বার্তায় আমাদের মনেও মুক্তির আশা সঞ্চারিত হয়। বিশ্ব জাহানের মহান মালিক আমাদের অতিশয় দয়ালু প্রভু আমাদেরকে মুক্তি দেয়ার জন্যেই রমযানকে পাঠান।

মানুষকে দোযখ থেকে উদ্ধারে রমযানের নানামুখী উদ্যোগ

- ♦ রমযানে জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে। যাতে করে নতুন কেউ আর সেদিকে প্রবেশ করতে না পারে।
- ♦ রমযানে শয়তান বন্দি থাকে। সে যেন আর কাউকে জাহান্নামের দিকে নিতে না পারে।
- ♦ রমযানে জান্নাতের দরজা খোলা থাকে। মানুষের স্রোত একমুখী হয়ে শুধু সেখানেই প্রবেশ করে।

রমযানের প্রতি রাতে অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দেয়া হয়। পরবর্তী প্রত্যেকটি রাতে পূর্বের সকল রাতের সম্মিলিত সংখ্যক পাপীকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হয়। এভাবে রমযানের শেষ রাতে গোটা রমযানে যত সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়, তার চেয়েও বেশি মানুষকে মুক্ত করা হয়।

জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য করণীয়

- ♦ জাহান্নাম ও জান্নাতের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করুন।
- ♦ যে সব কারণে মানুষ জাহান্নামে যায় সেগুলি সম্বন্ধে পরিস্কার জ্ঞান অর্জন করুন।
- ♦ জাহান্নামের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করুন। মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে নিরবচ্ছিন্নভাবে মিনতি জানাতে থাকুন।
- ♦ মানুষের জীবন ও পরিবেশে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টির সকল সংশ্লিষ্টতা বন্ধ করুন।
- ♦ জান্নাতের সুখ ও শান্তির ধারণা নিয়ে জান্নাত লাভের জন্য নিয়মিত দুআ করুন।
- ♦ আপনার চারপাশের অগণিত জাহান্নামগামী মানুষকে জান্নাতমুখী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। তাদের অবস্থা আপনাকে অবশ্যই ভাবিয়ে তোলা উচিত, বিচলিত করা উচিত।
- ♦ দোযখমুখী মিছিলের গতি বেহেশতমুখী করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টাকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। এ কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করুন।
- ♦ জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশায় রমযানের শেষ দশকের অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। দ্বিতীয় দশকের ক্ষমা এবং প্রথম দশকের দয়া পেলেই কেবল মুক্তি পাবেন। সুতরাং প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় দশক অর্থাৎ গোটা রমযান ধরেই আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবেন। জাহান্নাম থেকে মুক্তি মানে জান্নাত।

রমযান মাস রাত্রি জাগরণের মাস

শুধু মানুষই নয় বরং গোটা জীবজগতের জন্যে দিন ও রাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তায়ালা দিন ও রাতকে তাঁর অন্যতম নিয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মুমিন জিন্দেগীর উন্নয়নে রাত্রি জাগরণের গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পথে শক্তভাবে টিকে থাকার জন্যে যে জ্ঞান আমল ও আখলাক প্রয়োজন সঠিকভাবে রাত্রি জাগরণের অভ্যাস ব্যতিত তা অর্জন করা সম্ভব নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক রাত্রির শেষ অংশ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ তালাশের জন্য সবচেয়ে উত্তম সময় হিসেবে চিহ্নিত। মুমিনদের জন্যে রমযান থেকে বেশি সুবিধা অর্জনে রাত জেগে ইবাদতের কোন বিকল্প নেই।

রমযানের কার্যাবলি এমনভাবে সাজানো যেন সকল রোযাদার রমযানের রাতের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এমনিতেই জাগতে পারে। সারাদিন পর রোযাদার ইফতার শেষে ক্লান্তি বোধ করেন। তিনি বিশ্রাম চান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এশার নামাযের ডাক আসে। ফরজ সুন্নাতের সাথে যোগ হয় তারাবিহর নামায। শেষ রাতে জাগতে হয় তাহাজ্জুদ নামায ও সেহরী খাবার জন্য। এভাবে রমযান মানুষকে রাত্রি জাগরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

তারাবিহ

রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, রমযান মাসে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা ও আত্মসমালোচনাসহ রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে তাকে সকল গুনাহ থেকে মাফ করে দেয়া হবে। 'কিয়ামুল লাইল'-এর অর্থ রাত জেগে নামায পড়া। তারাবিহর মূল ধাতু হলো 'রাউহুন'। অর্থ আসা-যাওয়া করা, আরাম করা, প্রশান্ত হওয়া, প্রশান্তি পাওয়া, বিশ্রাম করা ইত্যাদি। দীর্ঘ সময় ধরে নামায আদায় করতে গিয়ে মুসল্লিগণের ক্লান্তি দূর করার জন্য বিরতি দেয়া হয়। এ নামাযকে তারাবিহ নামায বলে।

রসূলুল্লাহ (স.) এবং সাহাবীগণ রমযান মাসে নিয়মিত দীর্ঘ নামায আদায়ের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করতেন।

৩০ টি রোযাতে প্রতিদিন ২০ রাকাত করে ৬০০ রাকাত নামায আদায় আমাদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে লম্বা কিরাতে নামায পড়তে অভ্যস্ত করে তোলে।

তাহাজ্জুদ

তাহাজ্জুদ মূলত রাতের প্রথম অংশে ঘুমিয়ে রাতের শেষ অংশে ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করা বুঝায়। ইসলামী শরিয়তে ব্যক্তিগত ইবাদত ও আমলের মধ্যে তাহাজ্জুদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

বলে বিবেচিত। বছরের অন্যান্য সময়ে মুসল্লীরা তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত থাকে না। রমযান ছোট-বড় সবার জন্য তাহাজ্জুদ পড়ার এক অভিনব সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। একটু আগ্রহ থাকলেই পুরো রমযানে তাহাজ্জুদ আদায় করা সম্ভব হয়।

রাত্রি জাগরণে করণীয়

- ♦ রমযানের প্রতিটি রাত জেগে কাটানোর আভ্যাস করুন।
- ♦ প্রতি রাতে তারাবিহ পড়ার নিয়ত করুন।
- ♦ খতমে কুরআনসহ তারাবিহ আদায়ের ব্যবস্থা করুন।
- ♦ মসজিদের তারাবিহকে সুন্দর ধীর স্থির করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিন, ভূমিকা পালন করুন।
- ♦ তারাবিহর রাকাত সংখ্যা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করুন।
- ♦ তারাবিহকে ফরজের সমতুল্য ভাববেন না, আবার অবহেলাও করবেন না।
- ♦ ২৬ রমযান রাতে খতম তারাবিহ শেষ হওয়ার পরও কুরআনের দীর্ঘ তিলাওয়াতে তারাবিহ আদায়ের চেষ্টা করুন।
- ♦ মসজিদে সামষ্টিক ভাবে ব্যবস্থা করতে না পারলে দু চার জন মিলে বাসায় কিয়ামুল লাইলের আয়োজন করুন।
- ♦ রাত জেগে ইবাদত বলতে রাতের শেষ অংশ বা সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত ইবাদত করা বুঝায়। এশা তারাবিহ রাতের প্রথমাংশে শেষ করে সারারাত ঘুমিয়ে কাটানোর অভ্যাস পরিবর্তন করুন। রাত জেগে ইবাদত করে মসজিদগুলোকে রাতের ইবাদতে জমজমাট করে রাখুন।
- ♦ প্রতিদিনের তারাবিহতে হাফেজ যে অংশটুকু পড়েন তারাবিহর আগেই সে অংশটুকু আরবী ও তরজমাসহ পড়লে নামাযে বেশি আনন্দ ও মনোযোগ পাবেন।
- ♦ প্রত্যেক তারাবিহতে যতটুকু কুরআন পড়া হয় নামায শেষে তার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরার ব্যবস্থা করুন।
- ♦ বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার ব্যবস্থা করুন। রমযানের মহিমান্বিত রাতগুলিকে ইবাদত ও উৎসবে স্মৃতিময় করে রাখার জন্য কখনও কখনও তারাবিহর মাঝখানে বা শেষে মিষ্টি চা বা অন্যান্য হালকা নাস্তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ♦ রমযানের শেষ দিকে বেশি সজাগ সচেতন ও সক্রিয় থাকুন।
- ♦ প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করুন। সেহরীর ২০-২৫ মি. আগে উঠে অজু করে ২ রাকাত তাহিয়াতুল অজুসহ দু রাকাত করে তাহাজ্জুদ পড়ুন।

রমযান মাস এবং লাইলাতুল কদর

লাইলাতুল কদর অর্থ ভাগ্য রজনী। লাইল শব্দের অর্থ রাত বা রজনী। কদর শব্দের অর্থ ভাগ্য। আমাদের দেশে এটি শব ই কদর হিসাবে পরিচিত। এটি ফারসী এবং আরবী শব্দ। শব ফারসী শব্দ এবং কদর আরবী শব্দ। সুতরাং এদিক থেকেও শব-ই-কদর অর্থ ভাগ্য রজনী। পবিত্র কুরআনে কদর বিষয়ে অনেক উদ্বৃতি আছে। আল্লাহ তায়ালা কদর নামে একটি সূরা নাযিল করেছেন। সেখানে তিনি প্রথমে কদরের রাতে কুরআন নাযিলের কথা ঘোষণা করেছেন। এরপর তিনি কদরের রাতকে হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম ঘোষণা করেছেন। এবং সে রাতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত এবং শান্তি ও কল্যাণসহ জিবরাঈল (আ.) ও ফেরেশতা প্রেরণের কথা উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে তিনি কদরের রাতের সময়সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আরবী, বাংলা, ইংরেজী অভিধানে ভাগ্যের নানারকম অর্থ ও সংজ্ঞা দেয়া আছে। যেমন অদৃষ্ট নসিব কপাল নিয়তি পরিণতি দৈব ইত্যাদি।

সাধারণত আচমকা অসাধারণ কিছু একটা পাওয়াকে আমরা ভাগ্যবানের লক্ষণ মনে করি। নিয়মমত কষ্ট করে সময় দিয়ে মানুষ যা অর্জন করে, সেটাকে কেউ ভাগ্য বলতে নারাজ। এটা হলো তার নিজের হাতের কামাই। কিন্তু নিয়মের বাইরে অজানা অকল্পনীয় উপায়ে খুব সহজে অনেক বিরাট কিছু একটা কেউ পেলে সবাই তাকে ভাগ্যবান বলে। অর্থাৎ ভাগ্যের ব্যাপারটা মানুষের শ্রম বা চেষ্টার বাইরের একটা বিষয়।

মানব জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদির মধ্যে ভাগ্য সবচেয়ে জটিল একটি বিষয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সীমাহীন অগ্রসরতা সত্বেও এখন পর্যন্ত মানুষ ভাগ্যের কোন কূল কিনারা করতে পারেনি। ভাগ্য মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত একটি বিষয়। কখন কার ভাগ্যে কি ঘটে কেউই তা বলতে পারে না। একই নিয়ম একই কাজ, কিন্তু একেকজনের একেক অবস্থা। দৃশ্যতঃ সব কার্যকারণ উপাদানকে একই রেখে সবার ভাগ্যকে এক করা যায় না। এ এক বিচিত্র ব্যাপার। ভাগ্য নিয়ে ভাবতে গেলে বিস্ময়ের কোন শেষ নেই।

ভাগ্য এক আজব বিষয়। ভাগ্যের হাতে সবাই বন্দি। মানুষ ভাগ্য বিশ্বাস করলেও ভাগ্যের কিছু আসে যায় না। আবার অমান্য-অবিশ্বাসেও ভাগ্যের হেরফের হয় না। ভাগ্যকে অস্বীকার করেও কেউ ভাগ্যের জোরে অনেক উপরে উঠতে পারে। অন্যদিকে ভাগ্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিয়েও কেউ চরম দুঃখ দুর্দশায় জীবন কাটাতে পারে।

ভাগ্য হলো অজানা, ভাগ্য হলো ভবিষ্যত। মানুষের জন্য ভবিষ্যতের চিন্তা, ভাগ্যের চিন্তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভবিষ্যত কেউ জানে না। কিন্তু সবাই ভবিষ্যত নিয়ে ভাবে, চিন্তা

করে। ভবিষ্যত সামনে রেখেই মানুষ জীবন চালায়, কাজ করে। সব চেষ্টা পরিশ্রম ভবিষ্যতের জন্যে। ভাগ্য গড়ার প্রচেষ্টায় সবাই ছুটে চলে। আজকের জন্য আগামীকাল ভবিষ্যত, এবছরের তুলনায় আগামী বছর ভবিষ্যত। এভাবে যুগ শতকেরও ভবিষ্যত আছে। সুবিশাল অতীত থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্তমান দিয়ে জীবনের তরী বয়ে চলে সীমাহীন ভবিষ্যতের পানে।

ভবিষ্যত না থাকার অর্থ হলো জীবন অচল হওয়া, কাজ-কর্ম বন্ধ হওয়া, আয়-রোজগার থেমে যাওয়া। অন্যদিকে ভবিষ্যত থাকার অর্থ হলো জীবন সচল থাকা, কাজ-কর্ম চালু থাকা, আয় উন্নতির সম্ভাবনা থাকা। যেখানে ভবিষ্যত নেই, সেখানে কেউ থাকে না। সবাই চলে যায়, ছেড়ে দেয়, বিদায় নেয়। যার ভবিষ্যত নেই, তার কাছে কেউ থাকে না। কেউ পছন্দ করে না। ভালবাসে না।

ভবিষ্যত জানার জন্য মানুষ কতকিছু করে। ভবিষ্যত বানানোর জন্যও কত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ। অথচ এই ভবিষ্যত নিয়েই মানুষ সবচেয়ে বোকামীর পরিচয় দেয়, অবহেলা করে, ভুল করে, বাড়াবাড়ি করে।

খুব ভাল ভবিষ্যতওয়ালা একটা বিষয়কে ভুলক্রমে ভবিষ্যতবিহীন মনে করে ছেড়ে দিলে পরে পস্তাতে হয়। অন্যদিকে কোন ভবিষ্যত নেই, এমন একটা বিষয়কে খুব ভাল ভবিষ্যত আছে মনে করে ধরলেও পস্তাতে হয়। ভবিষ্যত ধরতে হলে তা হতে হয় নির্ভুল ও সঠিক। এব্যাপারে একটুও এদিক-সেদিক করার সুযোগ নেই।

মানুষ সারাজীবন কোন বিষয়ে শুরু থেকে শেষ জানতে চেষ্টা করে সফল হতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে খাদ্যের কথা বলা যাক। সকালে নাস্তায় যে রুটি এবং সবজি খাওয়া হয়, সে আটা সবজি কোন দোকান থেকে কেনা, সেটা জানা থাকতে পারে। কোন জমির গম আর কোন ভূমির সবজি সেটা জানা অনেকটা অসম্ভব। তেল লবণ পেঁয়াজ হলুদ যা ব্যবহার করা হয়, সেগুলির উৎপত্তি স্থান জানা আরও অসম্ভব। এসবের উৎপত্তি স্থান যে আছে তা একদম নিশ্চিত। কিন্তু এসব কোন ভূমিতে উৎপন্ন হয়েছে, দোকানদারের সেটা জানার কথা নয়। যে জমির গম এবং যে ভূমির সবজি আর যে ক্ষেতের লবণ পেঁয়াজ, তার মালিক জানে না কার পেটে সেগুলি যায়।

নাস্তা যিনি খান তিনি জানেন, রুটি ভাজি খেয়েছেন। তিনি আন্দাজ করতে পারেন, চার ঘন্টা পর এদের পরিণতি কি হতে পারে। দু চার দশদিন পর এসব কোথাও না কোথাও যায়। কিন্তু আটা সবজি পেঁয়াজ আদার শেষ অবস্থান তার পক্ষে কখনও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না।

পরিধানের এক টুকড়া কাপড় অথবা একটা জামার কথা চিন্তা করা যায়। কোথাকার বীজ দোকান থেকে কিনে আনে কৃষক। কোন ক্ষেতে হয় তুলার চাষ। কোন গাছের কতটুকু তুলা দিয়ে বানানো হয় সুতা। কাপড় তৈরি করে এক কোম্পানী। বিক্রি করে এক দোকানদার। জামা তৈরি করে দরজী। অতি প্রিয় জামার পিছনের ইতিহাস জানেন না বলা চলে। মাস ছয়েক পর কাজের বুয়া ছেঁড়া জামা দিয়ে ঘরের মেঝে মোছে। আরও

ছমাস এক বছরে জামার সুতার খোঁজও পায় না। পরিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে সুতার মৌলিক উপাদানগুলি মাটি বাতাস পানির স্তরে আটকে থাকে, দর্জী, দোকানদার, কোম্পানী, কৃষক, বীজ গবেষকসহ সবার চোখের আড়ালে। তার ভবিষ্যতের খবর কেউ জানে না। এভাবে আমাদের চারপাশের কোন একটি জিনিসের সুদূর অতীত অথবা শেষ অবস্থান সম্পর্কে আমরা কিছুই বলতে পারি না।

মানুষের উৎপত্তি সৃষ্টি ও জন্ম এবং মৃত্যু পরবর্তী মানুষের পরিণতি সম্বন্ধেও তেমন কিছুই জানে না মানুষ। মা গর্ভধারণের পূর্বে সন্তানের অবস্থান সম্পর্কে একেবারেই জ্ঞানশূন্য মানুষ। মায়ের পেটে অস্তিত্ব লাভের প্রথম প্রহর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অগণিত যে অবস্থান সে অতিক্রম করে তার খুব কম খবরই জানা থাকে মা-বাবা আত্মীয় স্বজনের। জন্মগ্রহণের পর থেকে তার অবস্থার সব পরিবর্তন খেয়াল করেও তার জীবনের খুব অল্প তথ্যই সংগ্রহ করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে জীবনের শেষ পরিণতি হলো মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর পরে আরও অনেক পরিবর্তন হয়। দশ বিশ একশ দিনে গলে পচে মাটির সাথে মিশে যায় দেহ। পাঁচ দশ বছরে হাড়-হাডিডও নিশ্চিহ্ন হয়। নিশ্চিহ্ন হওয়া মানে শেষ হওয়া নয়। এর একটি অবস্থা থাকে যা দৃষ্টিতে আসেনা, বুঝা যায় না। আসলে জানা নেই জীবন কি অবস্থায় আছে। ঠিক যেভাবে জানা ছিল না, মায়ের গর্ভে জাইগোট রূপ ধারণের আগে তা কেমন ছিল।

জীবনের একক হলো কোষ। প্রত্যেক কোষের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য অঙ্গানু। একেকটি অঙ্গানু গঠিত হয় কোটি কোটি মৌল দিয়ে। মৃত্যুর পর কোষ এবং তদসংশ্লিষ্ট অঙ্গানু ধীরে ধীরে মিশতে থাকে মাটিতে। সময়ের ব্যবধানে ভেঙ্গে তৈরি হয় লক্ষ কোটি মৌল উপাদান। যেগুলি খালি চোখে দেখাও যায় না, যাদের সারা শব্দ কানে শোনাও যায় না।

একটি শিশু দশ বিশ পঞ্চাশ বছরে তার শারীরিক গঠন ও আকার আকৃতির দিক থেকে কি রূপ নিবে তা আমরা অনেকটা আন্দাজ করতে পারি। তার কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারে বাবার স্বপ্ন সে বিখ্যাত প্রকৌশলী হবে। মা ভাবেন সে ডাক্তার হবে। সবই অজানা ভবিষ্যত। বাস্তবে সে হয়েছে রাজনীতিবিদ। মা-বাবা মেনে নেন। সবই ভাগ্য।

হঠাৎ করে এক সকালে শরীরে একটি ছোট্ট ফোঁড়া দেখলেন। দুদিন আগেও এটা ছিল না। দুদিন আগে এটা যেখানে ছিল, যে অবস্থায় ছিল, সেটা আপনি দেখতে পাননি। বুঝতে পারেননি। ফোঁড়া বিশেষজ্ঞ হলে হয়ত বুঝতে পারতেন।

আজ যেটা সামান্য ফোঁড়া। দুদিন পরে সেটাই আপনাকে কাতর করতে পারে। এই ছোট্ট ফোঁড়া আপনার লক্ষ টাকা খরচের কারণ, এমনকি আপনার প্রাণ নাশের কারণও হতে পারে। যা আপনি এবং চারপাশের কেউই কল্পনা করেনি। সময় সবাইকে সবকিছু বুঝিয়ে দেখিয়ে দেয়। এটাই ভাগ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবাদে মানুষ উল্লেখিত বিষয়াদির পরিবর্তন পরিক্রমার অবস্থা জানতে পারে।

ফসলের জমিতে কীটপতঙ্গ বা আগাছা দমনের জন্য যে কীটনাশক দেয়া হয়, মাটিতে পড়ার সাথে সাথে নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় তা রূপ বদলাতে থাকে। কিছু অংশ মিশে যায়

বাতাসে, কিছু অংশ গাছের শিকড় বেয়ে ঢুকে পড়ে গাছের শরীরে। কিছু অংশ মাটিতে থাকে। কীটনাশকের বোতল বা প্যাকেটের যে কীটনাশক জমিতে দেয়া হয় ১০/২০/১০০ দিন পর সেটা আর খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। কিন্তু ভিন্ন নামে অন্য রূপে তা বিচরণ করে আশে পাশেই।

অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশলের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে বাতাস উদ্ভিদ পানি ও মাটিতে মিশ্রিত কীটনাশকের সময় ভিত্তিক বিবর্তন ও রূপ। সাধারন মানুষ মনে করে কীটনাশক দিয়েছি, কীটপতঙ্গ মরেছে। ব্যস, এতটুকুই। বিজ্ঞানীরা বুঝে কীটনাশক আছে, অন্য কোথাও আরেক নামে। কিন্তু তারা জানে না কীটনাশকের রূপ বদল বন্ধ হবে কবে। কীটনাশকের রূপান্তর পরিক্রমা শেষ হবে তখন, যখন সেটা তার মৌলিক উপাদানে পৌঁছে স্থিতিশীল হবে।

একটা ঝড় টর্নেডো সাইক্লোন উৎপত্তির সূচনাতে মানুষের তেমন কিছুই জানা থাকে না। এগুলি যখন সম্প্রসারিত হয় অগ্রসর হয় তখন যন্ত্রপাতির মান, বিশেষজ্ঞের অবস্থা অনুযায়ী এর গতিবেগ, ধ্বংস ক্ষমতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট, সম্বন্ধে জানতে পারে। আবহাওয়া অফিস পূর্বাভাস দেয়। সাবধান সতর্ক করে। সেগুলির ক্ষয়ক্ষতি কমানোর চেষ্টা করে। যদিও মানুষ সেগুলির দিক পরিবর্তন, গতিবেগ বা আক্রমণের ধরন কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

উপরের আলোচনা থেকে ভাগ্য বা ভবিষ্যত জানার ব্যাপারে মানুষের সীমাবদ্ধতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যোগ্যতা দক্ষতার মাধ্যমে সে সীমাবদ্ধতা দূর করার সম্ভাবনার কথা বুঝা যায়। এখানেই ভাগ্য ও কর্মের সম্পর্ক। এ ব্যাপারে নানা দ্বিধা দ্বন্দ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সীমালংঘনও ঘটে। কেউ ভাবেন, ভাগ্যই সবকিছু, কর্মের প্রয়োজন নেই। অন্যেরা ভাবেন, ভাগ্য বলতে কিছুই নেই, সবই কর্ম।

একটি উদাহরণ দ্বারা এ সংক্রান্ত জটিলতা দূর করা যেতে পারে। স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যে ছাত্র নিয়মিত ক্লাশ করে না, সময়মত আসে না, লাইব্রেরী ল্যাবরেটরীর ধার ধারে না, শিক্ষকদের পরামর্শ মেনে চলে না, বাবা-মা'র শাসনও তোয়াক্কা করে না। পরীক্ষার আগে শিক্ষক ধমক দিয়ে বলেন, পড়াশুনা না করে এভাবে ঘুরে বেড়ালে তুমি পরীক্ষায় ফেল করবে। পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার পর ছাত্রটি সত্যি সত্যি ফেল করল। যেহেতু স্যার বলেছিলেন আমি ফেল করব, সেজন্যে আমি ফেল করেছি। আমার কোন দোষ নেই, আমার ফেল করার জন্য স্যার দায়ী। ছাত্রের এ বক্তব্য কেউ গ্রহণ করবে না। স্যার যদি তাকে বলতেন, তুমি ভাল রেজাল্ট করবে। সেটা কি ঠিক হতো? কোন স্যার এ ধরনের ছাত্রকে ভাল রেজাল্টের আশ্বাস দিতে পারেন না। অন্যদিকে, কোন ভাল ছাত্রকে যদি স্যার বলে, যে তুমি ভাল রেজাল্ট করবে এবং সত্যি সত্যি সে ভাল রেজাল্ট করে, তখন কেউ স্যারের ঐ মন্তব্যকে এভাবে মূল্যায়ন করে না যে স্যার বলেছিলেন বলেই ছেলেটি ভাল ফল করেছে।

শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে শিক্ষক বলেন, তোমাদের ভাল রেজাল্ট করার জন্য আরও পরিশ্রম করা উচিত। তখন সব ছাত্র একই প্রতিক্রিয়া দেখায় না। কেউ একটু গুরুত্ব

দেয়, কেউ যথেষ্ট সতর্ক, আবার কেউ মোটেও মনে রাখে না। যে বেশি গুরুত্ব দেয়, সে বেশি ভাল করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যে মোটেও গুরুত্ব দেয় না, সে আরও খারাপ করে।

কোন অজানা কারণে ভাল ছাত্র খারাপ করলে অথবা খারাপ ছাত্র ভাল করলে মানুষ এটাকে ভাগ্য বলে। খারাপ ছাত্রকে সৌভাগ্যবান আর ভাল ছাত্রকে দুর্ভাগ্য হিসাবে বিবেচনা করে। এখানে মূলতঃ ২টি কার্যকরী বিষয় লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকের ভূমিকা। ছাত্রের ভূমিকা।

শিক্ষক ছাত্রের কল্যাণ চান। কিভাবে ছাত্র ভাল করতে পারে তা জানিয়ে বুঝিয়ে দেন। যে ছাত্র চেষ্টা করে, তাকে সাহায্য সহযোগিতা করেন। যে ছাত্র দুষ্টুমি করে তাকে শাসন করেন, সাবধান করেন। কোন ছাত্রের ব্যাপারে তিনি নিজ থেকে জোর খাটিয়ে ভাল বা মন্দ করে দেন না। তবে ছাত্রের অবস্থা অনুযায়ী তিনি কে ভাল আর কে মন্দ তা বুঝতে পারেন। শিক্ষক ছাত্রের অর্জিত ফল নিজ ইচ্ছাতে উলোট-পালট করেন না। পরীক্ষার ফল নির্ধারণের জন্য যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি আছে সে অনুযায়ীই ছাত্রদের ফলাফল নির্ধারণ করেন। ছাত্রদের ভাল অথবা মন্দ ফলাফলের জন্য শিক্ষককে মোটেও দায়ী করা যায় না।

পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণে ছাত্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাল ফলাফলের জন্য শিক্ষকের উপরে নির্ভর করে বসে থাকলে চলে না। ছাত্রকে অবশ্যই সাধ্যমত চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা অনুযায়ী ছাত্র ফল পায়। ছাত্রের কর্মই তার ফল নির্ধারণ করে।

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভাগ্য। প্রত্যেক মুসলমান মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ভাগ্যের ভাল ও মন্দ আল্লাহ তায়ালা নিয়ন্ত্রণ করেন। সুখ বা দুঃখ কোনটার উপরে মানুষের হাত নেই। সাফল্য ও ব্যর্থতার চূড়ান্ত মালিকানা মহান স্রষ্টা আল্লাহর হাতে। সব কিছুই তাঁর বেধে দেয়া ছকের অধীন। মহান আল্লাহ স্রষ্টা হিসাবে সৃষ্টির নানাবিধ বিষয় নিজ থেকে নির্ধারণ করেন। সেসব বিষয়ে মানুষের কিছুই করার থাকে না। সেগুলি নিয়ে মানুষের কোন দোষ হয় না, ভুল হয় না।

যে সব বিষয় তিনি মানুষের কর্মের আওতায় নির্ধারণ করে দেন কেবলমাত্র সেগুলির ব্যাপারেই মানুষের দায়িত্ব থাকে। যারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয় তারা অবশ্যই সফল হয়। অন্যথায় সব ব্যর্থতার জন্য মানুষই দায়ী হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত কিছুর সূচনাতে থাকেন, প্রত্যেক পরিবর্তনের অবস্থা জানেন এবং তিনি সবকিছুর সর্বশেষ অবস্থাও দেখেন।

সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই একমাত্র ভবিষ্যত জানেন। মানুষের চূড়ান্ত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ঠিকানা হিসাবে তিনি নির্ধারণ করেছেন জান্নাত ও জাহান্নাম। যে ব্যক্তি জান্নাত পায় সে চরম সাফল্য পায়, আর যে জাহান্নামে যায়, সে চরম ব্যর্থ হয়। জান্নাতবাসীরাই সবচেয়ে সৌভাগ্যবান, অন্যদিকে জাহান্নামীরাই হতভাগ্য।

তিনি মানুষের জন্য যাবতীয় ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম বিধান নির্ধারণ করেন। তিনি কখনও তাঁর নিয়ম লংঘন করেন না। তাঁর বেঁধে দেয়া নিয়মের সর্বোত্তম অনুসারী হলেন নবী ও রসূলগণ। তাঁরা হলেন মহা ভাগ্যবান। কর্মক্ষমতা যোগ্যতা দক্ষতায় তাঁরা সর্বাপেক্ষা

অভিজ্ঞ-বিশেষজ্ঞ। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের মাধ্যমে মানবমণ্ডলীকে ইহকাল ও পরকালের নানাবিধ ভবিষ্যত বিষয়াদি সম্বন্ধে সতর্ক করেন, পথ দেখান। যারা তাঁদের দেখানো পথে অগ্রসর হয় তারা সফল হয়, যারা তাদেরকে অমান্য করে, তারা ব্যর্থ হয়।

সূদুর ভবিষ্যতের যে সব বিষয়াদী মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, সে সব বিষয়াদি মহান আল্লাহ নিজ দয়ায় মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষ সাধারণত দু-চার বছরের বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। শত সহস্র বছরের জীবনের জটিল বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাই তিনি মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সূদুর ভবিষ্যতের অগণিত অজানা বিষয়ে অগ্রিম জানিয়ে দিয়েছেন। এসব তথ্য জানা তথ্যের সাথে মিলিয়ে জীবনের অসীম ভবিষ্যতের সৌভাগ্যবান হওয়ার পক্ষে মানুষ পরিকল্পনা নিবে, পদক্ষেপ নিবে।

মানুষের চির শত্রু শয়তান মানুষকে দোযখ-বেহেশত নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ দিতে চায় না। ঐ দীর্ঘ ভবিষ্যত, এত দূরের ভাবনা সে মানুষকে করতে দেয় না। সে মানুষকে এক-দুঘণ্টা দু-চারদিন পাঁচ-দশ বছরের ভবিষ্যতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করতে চায়। যখনই মানুষ এ সংক্ষিপ্ত ভবিষ্যতের মধ্যে আটকা পড়ে, তখনই সে তার জীবনের সুদীর্ঘ অপর প্রান্তের কথা বিস্মৃত হয়। জীবনের সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একটা অতীব ক্ষুদ্র অংশের সাফল্য -ব্যর্থতার পেছনে তার সব শক্তি সময় সম্পদ ব্যয় করে।

শয়তান আমাদেরকে বুঝায়, এইতো কয়েকদিনের জীবন। এত ভাবনা চিন্তার কি আছে? জীবনটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? যা খেতে চাও পড়তে চাও খাও পড়। দু দিনের জিন্দেগী আনন্দ ফুর্তি কর। অত হিসাব নিকাশের প্রয়োজন নেই। জীবন তো একটাই। এরপর কিছুই নেই। পরকাল আখেরাত দোযখ বেহেশত সব ভুয়া, মিথ্যা। সে জানে, সে মিথ্যাবাদী, প্রতারক। শত্রুকে বোকা বানানোর জন্য সে তো মিথ্যা বলতেই পারে। মানুষ যে তার প্রাণের দুশমন। মানুষকে তার ভুল করাতেই হবে। সেজন্যে মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা বানানোতে সে ওস্তাদ। শয়তানের তো কোন জ্ঞান ছিলনা। সে তো বস্তুসমূহের নাম বলতে পারেনি। সে তো মূর্খ। বোকা, ভণ্ড। সে ভুল করবেই। সে ভুল করেছেও।

শয়তান তো ভাগ্যবান নয় বরং হতভাগ্য। শয়তানের কোন দূরদৃষ্টি নেই। আদমকে সিজদা না করলে কি সূদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, ভবিষ্যত অবস্থা কি হতে পারে, সে এতসব চিন্তা করতে পারেনি। শয়তানের নীতি হলো নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক। সে যদি ভবিষ্যত বুঝত, এর পরিণতি কি হতে পারে সেটা যদি জানত, সে লাভবান হবে না ক্ষতিগ্রস্থ হবে এসব চিন্তা করত, তাহলে হুট করে সে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে পারত না।

কিন্তু মানুষ কখনও এরকম করবেনা। মানুষ প্রত্যেকটা পদক্ষেপ এর ভবিষ্যত পরিণতি ও ফলাফল কি হতে পারে, সেটা ভেবে চিন্তে কাজ করবে। কারণ মানুষকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। সে শিক্ষিত, সে জানে। সে সবার সামনে প্রমাণ করেছে, সে জানে, বুঝে। সেতো মূর্খের কথায় কান দিতে পারে না। শয়তানের বুদ্ধি মতামত ও পরামর্শ নিতে পারে না।

রমযান মাসে কদরের রাত্রির উপস্থিতি মানবজাতিকে ভাগ্য নিয়ে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করে। তার ভবিষ্যত তার চূড়ান্ত পরিণতি সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলে। সব হতাশার দোলাচল অতিক্রম করে সৌভাগ্যবানদের কাতারে সামিল হওয়ার স্বপ্ন দেখায়।

- কদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।
- কদরের রাত অত্যন্ত মুবারক ও বরকতময়।
- কদরের রাতই ভাগ্য রজনী।
- কদরের রাতে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়।
- কদরের রাত সালাম ও শান্তির রাত।
- কদরের রাত নামায আদায় ও গুনাহ্ মাফের রাত।

বিশেষ কোন মাস বা রাতকে ভাগ্য পরিবর্তনের উৎস মনে করা উচিত নয়। মহান আল্লাহ ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। কুরআন গ্রহণ ও ত্যাগের সঙ্গে ভাগ্যের সম্পর্ক। শক্তভাবে কুরআন ধরার মাধ্যমে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব। কুরআন বাদ দিয়ে অন্য কোন উপায়ে কেউ কখনও ভাগ্যবানদের দলভুক্ত হতে পারে না।

লাইলাতুল কদরে করণীয়

- ভাগ্য সম্পর্কে বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে সঠিক স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ করুন।
- ভাগ্যের উপরে অন্ধভাবে নির্ভর করে কর্মহীনতার ধারণাকে প্রশ্রয় দিবেন না।
- সৌভাগ্যবানদের উদাহরণ অনুসরণ করুন।
- দুর্ভাগাদের পথ মতকে অগ্রাহ্য করুন।
- ভাগ্য গণনার নানাবিধ প্রচলিত পন্থাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করুন।
- গোটা রমযানকে ভাগ্যোন্নয়নের উৎস বানিয়ে ফেলুন। কোনক্রমেই শুধু ২৭ রমযানকে ভাগ্য রজনী হিসাবে সীমাবদ্ধ করবেন না।
- অন্ততঃ রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে কদর অনুসন্ধানের চেষ্টা করুন।
- কেবলমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাকেই ভাগ্য জানা ও নিয়ন্ত্রণের মালিক মনে করুন। অন্য আর কাউকে এ অধিকার দিবেন না।
- অন্যায় ও অবৈধভাবে সম্পদ সুনাম ও ক্ষমতা লাভকারীদেরকে কখনও ভাগ্যবান মনে করবেন না।
- সৎ ও ন্যায়পরায়ণদেরকে বাহ্যিকভাবে দুর্বল দরিদ্র ও অক্ষম দেখে হতভাগা মনে করবেন না।
- লাইলাতুল কদরে নিম্নোক্ত দুআটি করা সুন্নাহ
  - **আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী**
    হে আল্লাহ্! আপনি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু, ক্ষমা করতে আপনি ভালবাসেন; অতএব, আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন। (আহমদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

রমযান মাস ইতিকাফের মাস

ইতিকাফের আভিধানিক অর্থ কোন জিনিষ আঁকড়ে ধরা এবং তাতে আবদ্ধ থাকা, নিমগ্ন থাকা। সে হিসেবে ইতিকাফ হলো আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকার উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করা। রমযান থেকে সাফল্য অর্জনের জন্য বিশেষভাবে যে সব ইবাদতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় ইতিকাফ তার মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.) কে পবিত্র কাবা ঘরের তদারকির ব্যাপারে যে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের বিষয় উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে ইতিকাফও একটি। রসূল (স.) প্রত্যেক বছর রমযানে শেষ দশ দিন মসজিদে নববীতে ইতিকাফ করেছিলেন। রমযান মাসের শেষ দশক ইতিকাফ করা সুন্নত। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণ করার অংশ হিসাবে ইতিকাফ করার নিয়ত করলে ইতিকাফ পালন ওয়াজিব হয়।

দ্বীনি ব্যাপারে আমাদের সবধরনের দুর্বলতার প্রধান কারণ দুনিয়াপ্রীতি। দুনিয়ার মধ্যে ডুবে থেকে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। প্রচলিত বিষয়াদির ভালবাসা আমাদেরকে আশ্বস্ত করে না। বস্তুর মধ্যে ডুবে থেকে আমরা আল্লাহর ভয় পুরোপুরি অর্জন করতে পারি না। শিরক বিদআতে ভরপুর পরিবেশে আল্লাহর আনুগত্যের এ অভাব পূরণে এক অভাবনীয় সুযোগ তৈরি করে ইতিকাফ। ইতিকাফের মাধ্যমে আমরা আংশিকভাবে দুনিয়াবী সংশ্লিষ্টতা থেকে মুক্ত হয়ে মসজিদে অবস্থান করি। ফলে আত্মিক উন্নয়ন ও আল্লাহ্ তায়ালার জন্য নিবেদিত হওয়ার এক অবিস্মরণীয় সুযোগ পাওয়া যায়। আল্লাহর প্রশংসা, ইবাদত ও দুআ প্রার্থনাতে নিজেকে মগ্ন রাখা যায়। ইতিকাফ আমাদেরকে সব কিছুর টান উপেক্ষা করে, অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে মহান মালিকের সংস্পর্শে একান্তভাবে সময় কাটানোর সুযোগ করে দেয়। সারাটা বছর স্বাভাবিকতার মধ্যে মনিবের কথামত চলার যে স্বাদ, ইতিকাফের মাধ্যমে মালিকের একান্ত সান্নিধ্যের ভিন্ন ধরনের কিছু স্বাদ আস্বাদন করা যায়। নিরবচ্ছিন্নভাবে শেষ ১০ দিন আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকার কারণে বহু আকাঙ্খিত শব-ই-কদর লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

অন্য সময় যে রংটা ভাল লাগে, ইতিকাফে সে রং ছেড়ে আসতে হয়। এতদিনের আকর্ষণ-আকৃষ্টের বিষয়ের বাইরে, ইতিকাফ অন্যরকম এক আকর্ষণের উৎসের সন্ধান দেয়। ইতিকাফকারীর কর্মচঞ্চলতা, ব্যস্ততা, দিন রাতের সিডিউল, সব কিছুই আলাদা হয়। তার অলস সময় কাটানোর সময় থাকে না। রমযানের আগে গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু অর্জন করা যায় না, এ ৯/১০ দিনের মধ্যে তা আয়ত্ত্বে আনতে হয়। কঠোর সাধনা অনন্ত পরিশ্রম করতে হয়। রমযানের শেষে অন্যেরা যখন ঈদ আয়োজনে ব্যস্ত, ইতিকাফকারী তখন অন্য এক ঈদের ব্যবস্থাপনায় বিভোর থাকেন। মহান মালিকের একান্ত সান্নিধ্যে থাকার উপযুক্ততা তাকে প্রমাণ করতে হয়। অন্যদের কাছে যা সুন্দর, ইতিকাফকারী সেটার পরিবর্তে ভিন্ন এক সুন্দরের খোঁজ করে। আর দশজন যে সুর যে আওয়াজে কান লাগায় মনোযোগ দেয়, ইতিকাফকারী তখন সবচেয়ে সুমিষ্ট অন্য এক আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় থাকে।

ইতিকাফে করণীয়

- ইতিকাফের ব্যাপারে আগ্রহী হোন। সাধারণত বৃদ্ধ ও কম জানাশুনা লোকেরা ইতিকাফ করে। যুবক, মধ্যবয়সী এবং কর্মঠ ব্যক্তিরা ইতিকাফ করুন। আলেম ওলামাগণ এ ব্যাপারে বেশি মনোযোগ দিন।
- ইতিকাফ নিয়ে হৈ চৈ ধুমধাম আনুষ্ঠানিকতা প্রচার প্রোপাগান্ডা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করুন।
- ইতিকাফে আল্লাহকে নিয়ে বেশি বেশি ভাবুন এবং তাঁকে জানুন। তাঁর প্রশংসা ও গুণগান এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন।
- গতানুগতিক কুরআন তিলাওয়াত, নামায, তাসবিহ পাঠে সন্তুষ্ট না থেকে সবকিছুর গভীরে প্রবেশ করে উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জনে চেষ্টা করুন।
- ঘনিষ্ঠ মুসল্লি ও সঙ্গী-সাথীদেরকে আগের থেকে উদ্বুদ্ধ করুন। অভিজ্ঞ কারো সাথে পরামর্শ করে ভাল পরিকল্পনা ও কর্মসূচী তৈরি করুন। মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জিন, কমিটির সভাপতি সেক্রেটারীসহ শিক্ষিত সক্রিয়দের ইতিকাফ করা উচিত।
- মহল্লার মসজিদে নিজেরা ইতিকাফ না করে পয়সার বিনিময়ে সাধারণ মানের ধার করা মানুষকে দিয়ে ইতিকাফ করানো ঠিক নয়।
- ইতিকাফ অবসস্থায় অর্থসহ কুরআন পাঠ, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূরা দুআ তাসবীহ মুখস্থ করা, বিশেষ বিষয়ে গবেষণা পর্যালোচনা, দীর্ঘ সময় ধরে নামাযের অভ্যাস করা, আগামী বছরের দ্বীনি ও দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন, কোনদিন পড়েননি এমন হাদীস গ্রন্থ, মুসলিম মনীষীদের জীবন চরিত অধ্যয়ন, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তাসবীহ দরূদ ইত্যাদি নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন।
- প্রতিদিনের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করুন। প্রতিটি আগামী দিন যেন আগের দিনের চেয়ে উত্তম ও উন্নত হয়।
- ইতিকাফকারীর হাতে মাত্র ৯/১০ দিন বেঁধে দেয়া সময়। ইতিকাফকারীকে সবধরনের সহযোগিতা করা মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিন কমিটির লোকজন এমনকি মুসল্লিদেরও সজাগ সচেতন থাকা প্রয়োজন।
- ইতিকাফকারীর জন্যে দিনের চেয়ে রাতে বিশেষ করে গভীর রাতের আমলে আনন্দ থাকে বেশি। তারাবিহর পর দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ুন। সেহরীর আগে ঘন্টা দুয়েক সময় নিয়ে জাগুন। দীর্ঘ সময় ধরে লম্বা কিরাতে তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল লাইল করুন। সুন্দর ভাবে দুআ করুন। হাফেজ থাকলে বা হাফেজ সংগ্রহ করতে পারলে একটা খতম করার চেষ্টা করুন। সম্ভব হলে যে অংশ দিয়ে নামায পড়বেন সে অংশটুকুর বাংলায় তরজমা আগেই ভাল করে পড়ে নিন। রুকু সিজদাহর নির্দ্ধারিত তাসবিহ ছাড়াও রসূল (স.) এর পাঠকৃত তাসবিহ এবং দুআ পাঠ করুন। নামাযের রুকু সিজদা দীর্ঘ করুন।
- একসঙ্গে বেশ কয়েকজন ইতিকাফ করার সময় সাধারন দুনিয়াবী গল্প বা আড্ডা এবং হাসি ঠাট্টা সম্পূর্নভাবে পরিত্যাগ করুন। তবে বিভিন্ন কাজকর্মে পরস্পরকে সহযোগিতা করুন। ইফতার সেহরী একত্রে করুন, মাঝে মধ্যে একত্রে দুআ করুন।

রমযান মাস ও নামায

নামায অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক ইবাদত। বছরের অন্য মাসের চেয়ে রমযানের মর্যাদা যেমন অনেক বেশি, একইভাবে বছরের অন্য সময়ের নামাযের তুলনায় রমযান মাসের নামাযের গুরুত্বও অনেক বেশি।

নামাযের সাথে কুরআনের এক সুগভীর সম্পর্ক আছে। অন্যদিকে রমযানের সাথে কুরআনেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এমতাবস্থায় রমযানে নামাযের অবস্থা গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। রমযান উদযাপনের সাফল্য পরিমাপের অন্যতম মানদণ্ড হলো নামায। নামাযের বিষয়টি অবহেলা করে আর অন্য কোন উপায়ে রমযানকে সফল করা সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহর কাছে নামাযের ব্যাপারটি কত গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝা যায়, রমযানে যেখানে খাওয়া ঘুম এমনকি অন্যান্য দৈনন্দিন কার্যক্রম হালকা বা কমানোর ব্যবস্থা করা হয়, সেখানে রমযানে নামাযের পরিমাণ অন্য সময়ের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি করা হয়।

রসূলুল্লাহ (স.) রমযান মাসের যে দুটি করণীয় সম্বন্ধে হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন তার একটি হলো রোযা পালন, আর অন্যটি হলো কিয়াম বা দাঁড়ানো বা নামায আদায়। হাদীসে কিয়ামুল লাইল বলাতে এটা রাত্রির নামায সম্পর্কে বেশি প্রযোজ্য। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি রমযান মাসে ফরজ নামাযের মর্যাদা কেমন হয়।

এ মাসে এক ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করলে অন্য মাসের সত্তর ওয়াক্তের সওয়াব। এক রাকাত নফল অন্য মাসে এক রাকাত ফরযের সওয়াব।

রমযান নামায উন্নয়নে সাহায্য করে

বছরের অন্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি মুসলিম রমযানে নামায আদায় করে। অনেকে সারা বছর নামায না পড়লেও রমযানের এক মাস এক ওয়াক্ত নামায বাদ দেয় না।

প্রতি বছর রমযান অনেক নতুন মুসল্লি সৃষ্টিতে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। অন্য সময়ে জুম্মাতে যে মুসল্লি হয়, রমযানে ওয়াক্তিয়া জামাতেও তার চেয়ে বেশি মুসল্লি হয়। আর জুম্মাতে তো সবখানে উপচে ভরা ভীড় দেখা যায়। মসজিদের গুটিকয়েক নিয়মিত মুসল্লি রমযানে মসজিদ ভরা মানুষ দেখে আনন্দে আপ্লুত হয়। ইমাম সাহেবের সুরে ঝংকার সৃষ্টি হয়। খতিবদের বক্তৃতার পালে হাওয়া লাগে।

বছরের অন্য সময়ে নিয়মিত নামাযীও ফরজ ওয়াজিব ছাড়া সুন্নাতগুলি আদায় করে না। খুব কম সংখ্যক মুসল্লি নফল নামায পড়ে। অথচ রমযান মাসে প্রায় সবাই ফরজ ওয়াজিব

সুন্নাতসহ নফল মুস্তাহাবও বেশি বেশি আদায় করার চেষ্টা করে। তারাবিহ ও তাহাজ্জুদ রমযান মাসের অতিরিক্ত নিয়মিত বৃহত্তম আমল হিসাবে স্বীকৃত।

রমযান মুসল্লিদেরকে দীর্ঘ নামাযের স্বাদ আস্বাদনে সাহায্য করে

বড় সূরা মুখস্ত না থাকা, ব্যস্ততা এবং সময়ের অভাব ইত্যাদি কারণে সারা বছর খুব কম সংখ্যক মুসলমান দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়তে পারে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত সময়ে তাড়াহুড়া করে অতি দ্রুত নামায সম্পন্ন করা হয়। নামাযের ফল না পাওয়ার ব্যাপারে এটা একটা অন্যতম কারণ। রমযান মুসল্লিদেরকে সুদীর্ঘ সময় ধরে নামায আদায় করার এক সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে। অন্য সময় যারা ঝটপট দু-চার রাকাত নামায পড়ে কেটে পড়ত, তারাও রমযানে তারাবিহর মাধ্যমে দেড় থেকে দুই ঘন্টা ধরে নামাযের মধ্যে লেগে থাকে। দীর্ঘ সময় নিয়ে ধীরস্থিরভাবে নামায আদায়ের আনন্দ উপভোগ করে।

সেহরীর সুবাদে সবাইকে শেষ রাতে উঠতে হয়। যারা কোনদিনই শেষ রাতে নামায পড়ার কল্পনা করেনি তারাও দু চার রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগ পায়। শেষ রাতে মহান মালিকের সান্নিধ্যে আসার স্বাদ কিছুটা হলেও তারা অনুভব করে।

শব-ই-কদরের রাতকে কেন্দ্র করে মুসল্লিদের মধ্যে নামায নিয়ে কত প্রতিযোগিতা হয়। বিশেষ করে রমযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার সুবিশাল অঞ্চল জুড়ে নামাযের অবস্থান মানুষ প্রাণ ভরে উপভোগ করে।

মসজিদ কমিটির যে লোকজনকে কালেভদ্রেও দেখা যেত না তারাও খুব সক্রিয় হয়। রমযানকে কেন্দ্র করে মাস দুয়েক তাদের দৌড় ঝাঁপ বেড়ে যায়। সভা আলোচনা পর্যালোচনা চলে। এভাবে রমযান নামায সংশ্লিষ্ট সবাইকে দারুণভাবে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করে। রমযানের পুরো এক মাসের প্রভাবে কত বেনামাযী নামাযী হয়, কত অনিয়মিত মুসল্লি নিয়মিত মুসল্লি হয়। অগণিত নিষ্ক্রিয় মানুষ নানাভাবে সক্রিয় হয়। রমযান নামাযের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে অবদান রাখে।

সুতরাং রমযানকে অতি সহজে নামাযের মাসও বলা যায়।

নামায উন্নয়নে করণীয়

- নামাযের ধারাবাহিকতার ব্যাপারে সতর্ক হোন, কারণ আল্লাহর ভয়ে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা না খেয়ে রোযা পালন করে তারা নামাযের ব্যাপারে কখনোই উদাসীন হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বরং নামাযের ব্যাপারে সতর্ক করে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।
- পবিত্রতা-অজু ও গোসলের ব্যাপারে বিশেষ করে প্রস্রাব ও পায়খানার বিষয়ে অনেক বেশি সাবধান সতর্ক হোন।

- ফরজ নামাযের ব্যাপারে অত্যধিক যত্নবান হোন।
- যে কোন মূল্যে নামায কাজা করা/ বাদ দেয়া বন্ধ করুন।
- বিশেষ করে ঈদের বন্ধে বাড়ি যাওয়ার পথে এবং কেনা কাটার ব্যস্ততায় রমযানের শেষ দিকে নামায কাজা না করার ব্যাপারে বেশি সজাগ-সর্তক থাকুন।
- যে সব কারণে/ অবস্থায় আপনার নামায কাজা হয় বা বাদ পড়ে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। মহান আল্লাহর কাছে নামায কাজা না হওয়ার জন্য সাহায্য চেয়ে দুআ করুন।
- পুরুষেরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামায়াতে পড়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করুন। ৩০ দিন×৫=১৫০ ওয়াক্ত নামায যদি জামাতে পড়তে পারেন, তাহলে ঈদের দিন সকালে এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করবেন। পৃথিবীর আর কোন কিছু আপনাকে অনুরূপ আনন্দ দিতে পারবে না।
- তাহিয়্যাতুল অজু, দুখুলুল মাসজিদ, ইশরাক, চাশত, আওয়াবিন সহ অন্নান্য নফল নামাযের অভ্যাস করুন।
- নামাযের সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ক্রটিগুলোর মান উন্নয়নে পদক্ষেপ নিন। নামাযের ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত সমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করুন।
- নামাযের সূরা দুআ তাসবীহর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থ শিক্ষা করুন।
- তাড়াহুড়া না করে ধীর স্থির ভাবে নামায আদায় করুন।
- নামাযের গুরুত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করুন।
- নামাযে মনোযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিন।
- নামাযের প্রভাব স্থায়ী হতে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করুন।
- নামাযের আগে পরের কাজ সম্বন্ধে চিন্তা ঝেরে ফেলুন এবং নামায শেষে দুআতে সব বলার অভ্যাস করুন।
- ব্যক্তিগত নামায দীর্ঘ করুন।
- নামাযের শিক্ষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করুন এবং বাস্তব জীবনে এগুলি সাধ্যমত পালন করুন।
- বাসায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে মাঝে মধ্যে তাহাজ্জুদ আদায়ের চেষ্টা করুন।
- সুন্নত নফল নামায বাসায় পড়ার অভ্যাস করুন।

রমযান মাস দুআ কবুলের মাস

ছোট্ট এক শব্দ দুআ। দুআর অর্থ চাওয়া। এর তাৎপর্য সীমাহীন। সমস্ত সৃষ্টির যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া পাওয়া পুরনের অন্যতম উপায়। মানব জীবনে দুআর গুরুত্ব অপরিসীম।

মানব জীবনকে সচল ও স্বাচ্ছন্দ রাখার জন্যে নিয়মিত দুআ করতে পারার কোন বিকল্প নেই। চাহিদা উপস্থাপনের সুযোগ না থাকাটা মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় এক সমস্যা। এটা যাবতীয় সংকটকে ঘনীভূত করে। হতাশা বিশৃঙ্খলা অকর্মণ্যতা সৃষ্টি করে।

নিজের চাওয়া পাওয়ার কথা বলার সুযোগ পেলে মানুষ আশান্বিত হয়, আনন্দ অনুভব করে ও সাফল্যের স্বপ্ন দেখে। দুআ করতে পারলে মানুষ হালকা হয়।

এ পৃথিবীতে মানুষের চাহিদা বলতে পারার উৎস খুবই সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে আধুনিক যান্ত্রিকতার সময়ে কেউ কারও চাহিদা শুনতে আগ্রহী হয় না। সবাই নিজেরটা বলার চেষ্টা করে, অন্যেরটার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একটা-দুটা বিষয় শোনার পর বিরক্ত হয়। একই বিষয় বার বার শুনতে পছন্দ করে না। খুব আপনজনের কাছেও চাওয়া পাওয়ার ব্যাপারে বলতে গেলে সংকোচ হয়, দ্বিধা দ্বন্দ হয়। সবাইকে সবকিছু বুঝানো যায় না। অধিকাংশই প্রার্থিত বিষয়ে কিছু করার সামর্থ রাখে না। মনের আকুতি প্রমাণ করতে না পারায় তা ভিতরেই জমতে থাকে, মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

যে নিজের জন্য চাওয়ার জায়গা পায় না, সে অন্যকে চাওয়ার সুযোগ দেয় না। যে কিছু দিতে পারে না, সে তার কাছে চাওয়ায় বিব্রত হয়। যে দিতে পারে সে তার কাছে চাওয়া পছন্দ করে।

মহান আল্লাহর কাছে দুআ করার সুযোগ মানুষের জন্য এক অবিস্মরণীয় নিয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তাঁর কাছে দুআ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে দুআ করতে সংকোচ বা অবহেলাকে অন্যায় ও পাপ ঘোষণা করেছেন। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা প্রতি মুহূর্ত তিনি দুআ শোনার জন্য প্রস্তুত থাকেন। একই বিষয় বার বার বলাতে অথবা একসাথে অনেক কিছু বলাতে তিনি কখনও বিরক্ত হন না। রাগ করেন না। আল্লাহর কাছে কোন দুআ কবুল না হয়ে যায় না। আল্লাহর কাছে দুআ করার জন্য কোন অপেক্ষা করতে হয় না। এপয়েন্টমেন্ট লাগে না। বিলম্ব করতে হয় না। মানুষের মনের সব কথা আল্লাহ

ছাড়া আর কারো কাছেই বলা সম্ভব হয় না। যে কথা মানুষ পৃথিবীর কারো কাছে বলতে পারে না সে কথা মানুষ অতি সহজেই আল্লাহর কাছে বলতে পারে। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। সেজন্যেই তিনি বান্দাহর প্রার্থনা করা পছন্দ করেন। আল্লাহর কাছে দুআর অভ্যাস অনেক বেশি সম্পদ শক্তি অর্জন সত্ত্বেও অহংকার ও হঠকারী হওয়া থেকে বিরত রাখে।

পবিত্র কুরআনে অগণিত দুআ উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর নবী ও রসূলগণ এবং তাঁর প্রিয় বান্দাহগণ দুআ করতে পছন্দ করতেন। তাঁদের ব্যবহৃত সুন্দর দুআও মানুষের জন্য দুআর উত্তম উৎস।

- দুআ নিজেই একটি ইবাদত।
- দুআ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।
- দুআ আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার উত্তম লক্ষণ।
- দুআ আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের উত্তম পন্থা।
- দুআ আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা ও সামর্থের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন।
- দুআ আল্লাহর রহমতের প্রতি আস্থাশীলতার লক্ষণ।

আল্লাহর কাছে দুআ করার ব্যাপারে অনীহা ও দুর্বলতা মানুষের জন্য চাওয়া পাওয়া উপস্থাপনের সকল সুযোগ সংকুচিত করে দেয়।

যদি কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস না করে তাহলে সে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবে দুআ করার উৎস হারিয়ে ফেলে। সময়মত সঠিকভাবে দুআ করতে না পারার কারণে নানাবিধ সমস্যা সংকট ও জটিলতায় আক্রান্ত হয়। দুআমুক্ত জীবনের বিষাক্ত ছোবলে সে নিজের অজান্তেই মহা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়ে থাকে।

আল্লাহর কাছে দুআ করতে অস্বীকারকারী শেষ পর্যন্ত তার চারপাশে তার কথা শোনার মত কাউকে পায় না।

পবিত্র কুরআনে রমযান মাস সম্পর্কিত আয়াতের সঙ্গে আল্লাহর কাছে দুআ করার বিষয় উল্লেখ হওয়াতে রমযান মাসে দুআর গুরুত্ব অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যেক রোযাদার মুমিন মুসলিম অবশ্যই খুবই অকৃপণভাবে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট থাকেন।

দুআ হতে পারে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক। নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ আনুষ্ঠানিক দুআর অন্যতম উদাহরণ। এছাড়াও নামাযের বিভিন্ন অংশে অনেক দুআ পাঠ করার সুযোগ হয়। সিজদারত অবস্থায় দুআ আল্লাহ তায়ালা খুব পছন্দ করেন।

দৈনন্দিন কর্মকান্ডের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দুআ ও তাসবীহ রয়েছে। সেগুলি আমাদেরকে সব বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনাতে সাহায্য করে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম কুরআনের একটি আয়াত। একটি উৎকৃষ্ট দুআও। সকল কাজে আল্লাহর নামে তাঁর দয়া ও করুণা কামনা করার সুযোগ করে দেয়।

দুআর বিষয়বস্তুকে মৌলিকভাবে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়।

- ♦ আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা
- ♦ রসূল (স.) এর উপর দরূদ পাঠ
- ♦ অপরাধ ও ভুলভ্রান্তি থেকে মাফ চাওয়া, এর জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ক্ষমা চাওয়া
- ♦ ছোট বড় সকল চাহিদা আল্লাহ তায়ালার কাছে উপস্থাপন করা এবং প্রত্যেক বিষয়ের সাফল্য অর্জনে তার হাওয়ালা করে দেয়া।

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করার উপায়

- ♦ মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামত সমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
- ♦ পবিত্র কুরআনে আল্লাহর প্রশংসার আয়াত অনুবাদসহ পাঠ করা।
- ♦ আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ অর্থসহ পাঠ করা।
- ♦ রসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহর প্রশংসায় যা পাঠ করতেন সে সব পাঠ করা।
- ♦ আল্লাহর প্রিয় বান্দাহগণের ব্যবহৃত সঠিক ও সুন্দর প্রশংসা বিষয়ক দুআ পড়া।
- ♦ মানুষের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা বর্ণনা করা।
- ♦ আল্লাহ তায়ালা খুশি হোন এমনভাবে তাঁর প্রশংসা করার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য কামনা করা।

রসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি দরূদ পাঠের উপায়

- ♦ বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থসহ আন্তরিকভাবে নামাযে দরূদে ইবরাহীম পাঠ করা।
- ♦ সহীহ হাদীস গ্রন্থ থেকে আরও অন্যান্য দরূদগুলি অর্থসহ পাঠ করা।
- ♦ পবিত্র কুরআনে রসূলুল্লাহ (স.) এর মর্যাদা ও সম্মান সম্বন্ধে আয়াত অর্থসহ তিলাওয়াত করা।
- ♦ নবী (স.) এর পরিবার ও সাহাবীবৃন্দকে দরূদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।
- ♦ নবী (স.) এর জীবনী ও ইতিহাস ভালভাবে অধ্যয়ন করা।
- ♦ রসূলুল্লাহ (স.) এর মর্যাদা ও সুনাম সুখ্যাতি ব্যাপকভাবে প্রচার করার চেষ্টা করা।

মাফ চাওয়ার উপায়

- ♦ অপরাধের গভীরতা অনুভব করে দুআ করা এবং অপরাধ স্বীকার করা।
- ♦ সংশোধনের প্রতিজ্ঞা করা
- ♦ নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাওয়া
- ♦ চালাকি গোপনীয়তার চেষ্টা না করা।
- ♦ অন্যদেরকে ক্ষমা করা।
- ♦ ক্ষমার বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা।

চাহিদা পূরণের উপায়

- নির্বিঘ্নে নিঃশঙ্কচিত্তে চাহিদার সব কথা বলা।
- যখন তখন সবসময় বলা।
- চাহিদা পূরণে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হওয়ার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা
- আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় চাহিদা অবশ্যই পূরণে সক্ষম, দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস নিয়ে দুআ করা।
- পরিপূর্ণ আশাবাদসহ দুআ করা।

দুআর জন্য করণীয়

- দুআ করাকে আল্লাহ তায়ালার অন্যতম নিয়ামত হিসাবে বিবেচনা করুন।
- দুআ করে আনন্দিত হোন, সন্তোষ অনুভব করুন।
- দুআ করতে অধৈর্য হবেন না। যা চেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে হুবহু তা প্রত্যাশা করবেন না।
- আল্লাহর উপরে আস্থা রাখুন, তিনি আপনাকে অবশ্যই আপনার প্রার্থনার চেয়ে উত্তম কিছু দিবেন।
- প্রার্থিত বিষয় পাওয়ার পর আন্তরিকভাবে শুকরিয়া আদায় করুন।
- দুআর শুরুতে এবং শেষে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও রসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি দরুদ পাঠের অভ্যাস করুন।
- রমযানকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে দুআ করুন।
- রমযানের চাঁদ দেখে অথবা চাঁদ উঠার খবর শুনে দুআ করুন।
- ইফতারীর পূর্বে দুআ করুন।
- প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সুন্নত নফলের পূর্বে দুআ করুন।
- প্রতি সোম বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদ আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দুআ করুন।
- শেষ রাতে তাহাজ্জুদ শেষে দুআ করুন।
- পরিবারের সবাইকে নিয়ে দুআ করুন।
- দৈনন্দিন কর্মকান্ডে মাসনূন দুআগুলি অর্থসহ পাঠ করার অভ্যাস করুন।
- অন্যদেরকে উত্তমভাবে দুআ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করুন।
- কুরআনের আরবী দুআ সমূহ বাংলায় তরজমাসহ পাঠ করার চেষ্টা করুন।
- রসূলুল্লাহ (স.) এর দুআসমূহ বাংলা তরজমাসহ আরবীতে পাঠ করার ব্যবস্থা করুন।
- নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়াদী মনের মত করে সাজিয়ে সুন্দরভাবে গুছিয়ে মহান মালিকের কাছে উপস্থাপনে যোগ্যতা অর্জন করুন।
- আল্লাহর কাছে যেভাবে দুআর মাধ্যমে যেভাবে আবেদন করেন সেভাবে অন্য আর কারও কাছে আবেদন-নিবেদন করবেন না।

রমযান ও ফিতরা

রমযান শেষে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে যে দান করা হয় সেটাকে ফিতরা বলে। ফিতরা মানে স্বভাব, স্বাভাবিক বা আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া বুঝায়। যেমন সারা দিন রোযা শেষে ইফতার এর মাধ্যমে রাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া। সারা রমযান মাস শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম দিন স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে যাওয়া হয় ঈদুল ফিতরের মাধ্যমে। ফিতরা ছোট বড় নারী পুরুষ ধনী দরিদ্র সকল মুসলমানের জন্যে ওয়াজিব। ফিতরার বিধান নির্দিষ্ট হয় দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে।

ফিতরার উদ্দেশ্য প্রধানত: দুটি

(১) রোযার মধ্যে সংঘঠিত ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন।

(২) ঈদের আনন্দে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা।

ফিতরার ব্যাপারে করণীয়

- শওয়ালের চাঁদ দেখার পর থেকে ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের পূর্বে ফিতরা পরিশোধ করা সর্বোত্তম।
- ফিতরার পরিমাণ নিয়ে মতপার্থক্য আছে। সাধারণভাবে এটা ১ সের ১২ ছটাক থেকে ২ সের ১২ ছটাক হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। ফিতরার পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হবেন না। এবং এর সুবিধাটুকু নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সরকার সব সময় নিম্নতম পরিমাণ নির্ধারণ করে। এটা দরিদ্র ও অভাবী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য। আপনি সারা বছর প্রধান যে মানের খাদ্য ব্যবহার করেন সে অনুযায়ী ফিতরা হিসাব করবেন।

রমযান মাস মানব সেবার মাস

সৃষ্টির সবাই মানুষের সেবা করে। প্রয়োজনে সময়, শ্রম, জীবন পর্যন্ত অকাতরে দিয়ে দেয়। তা সত্বেও মানুষের সীমাহীন চাহিদা পূরণ করা কোন সৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব হয় না। মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ সেবা নিশ্চিত করতে পারে কেবলমাত্র মানুষই। মানুষের শারীরিক অসুবিধা, মানসিক বেদনা, আর্থিক সংকট, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ থেকে উদ্ধারের ব্যাপারে অন্য একজন বা একদল মানুষই শুধু ভূমিকা পালন করতে পারে। দুনিয়ার সবকিছু করায়ত্ত হলেও একজন ভাল মানুষ যদি তার কাছে না থাকে, তাহলে সে সুখী হতে পারে না। অন্যদিকে শক্তি সম্পদ তেমন কিছুই নেই, কিন্তু একজন বিশ্বস্ত মানুষ তার সাথে আছে, তাহলে সে অনেক সুখী হতে পারে। যে মানুষ সারা জীবনে একজন মানুষের সঙ্গ পায়নি সে খুব হতভাগা।

আধুনিক পৃথিবীর এক ভয়াবহ চিত্র হলো সবাই মানুষের সেবা করে, কিন্তু মানুষ মানুষের সেবা করে না। মানুষ নিজেও প্রকৃতি প্রেমী গাছ প্রেমী, পাখি প্রেমী হওয়ার জন্যে চেষ্টা করে, কিন্তু মানুষকে মানব প্রেমী বানানোর জন্যে উল্লেখ করার মত তেমন কোন প্রচেষ্টা নেয় না। বরং মানুষকে ঠকিয়ে, মানুষকে বিপদে ফেলে আনন্দ উল্লাস করে।

কোলের শিশুকে কাজের বুয়ার কাছে রেখে মা পোল্ট্রি ফার্মে মুরগীর বাচ্চা লালন পালনের চাকুরী করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। নিজের বুকের দুধ না দিয়ে কাজের বুয়াকে দিয়ে কৌটার দুধ গুলিয়ে খাওয়ায়। মা ভুলে যায়, তার সন্তানের জন্য পৃথিবীতে তার বুকের দুধের বিকল্প কোন খাদ্য নেই। দামী খেলনা, উদ্ভট গেমস, আর অতিপ্রাকৃতিক টিভি প্রোগ্রামের আকর্ষণে ভুলিয়ে রেখে বাবা তার স্নেহের পরশ থেকে বঞ্চিত করে শিশুকে। অতিশয় কর্মব্যস্ততা মা-বাবাকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয় যে তাদের অভাব পৃথিবীর আর কোন মানুষ পূরণ করতে পারে না। এভাবে সবার চোখের সামনে অধিকাংশ মানব শিশু তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাথীদের পরশ থেকে বঞ্চিত হয়েই বড় হয়।

মানুষ আর্থিক অভাবটাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। সঠিক বিবেচনায় অভাবমুক্ত কোন মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব নয়। ধনী ব্যক্তিদের পয়সার অভাব না থাকলেও অন্য অভাব তাদের অনেক থাকে। অভাব বিষয়ে আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শুধু ধনীদেরকে গরীবদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান শোনা যায়। মনে হয় গরীব মানুষ মানুষের জন্য কিছুই করতে পারে না। অথচ দরিদ্র মানুষও কোন না কোনভাবে অনেক বেশি মানব সেবা করে। এক দম্পতির অগাধ ধন সম্পদ, খাওয়ার লোক নেই। তাদের কোন সন্তানাদি নেই। তাদের এ অভাব টাকা দিয়ে মিটানো সম্ভব নয়।

একজন লেখক ভাল লিখতে পারেন। তার এ কষ্ট খাদ্য দিয়ে দূর করা যায় না। ভাল দামী খাদ্য দিয়ে কবিতা চর্চা বন্ধ করতে বললে কোন লাভ হবে না। তাদের এসব সমস্যা সমাধানে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই তারা খুশি হবে।

একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে কতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় মানুষ। ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়। গাছপালা নষ্ট হয়, ফসল ক্ষেত নষ্ট হয়। উপযুক্ত পদক্ষেপ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে কত মানুষ কত সংস্থা কতভাবে সাহায্য সহযোগিতার চেষ্টা করে। সবকিছু পুষিয়ে দেয়া সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু সে দুর্যোগে নিহত স্বামীর অভাব, জলোচ্ছাসে তলিয়ে যাওয়া সন্তানের অভাব, হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীর অভাব পুষিয়ে দেয়ার কোন ক্ষমতা কারো নেই। কোন দাতা সংস্থা যদি ঘরবাড়ি সহ সব বৈষয়িক ক্ষতি পুষিয়ে দেয়, তবুও ঝড়ে হারানো আপনজনের ব্যাথায় সে কাতর থাকে। অন্যদিকে বৈষয়িক কোন সাহায্য সহযোগিতা না পেলেও হারানো বুকের ধন ফিরে ফেলে আনন্দিত হয় বাবা-মা।

নানা কারণে বিশ্বব্যাপী মানব সেবা কার্যক্রমের পরিধি ও প্রয়োজন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক হানাহানি সম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা, শ্রমিক মালিক সংঘর্ষ, অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, বিভিন্ন প্রকারের দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিনিয়ত অগণিত মানুষের স্বপ্ন সাধ ছিন্ন ভিন্ন করে একেবারে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, ন্যায্য পাওনা থেকে বিতারিত, নিম্নতম মানবিক সুযোগ সুবিধা না পাওয়া মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের চারপাশে। মানুষের প্রতি মানুষের অদ্ভুত আচরণে নির্বাক নিস্তব্ধ সমগ্র সৃষ্টি জগত।

রমযান মানুষকে মানুষের কল্যাণে নিযুক্ত করে। রমযান মাসে যে কুরআন নাযিল হয়েছে সে কুরআন মানুষকে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করে এবং যাবতীয় দিকনির্দেশনা দেয়। মানুষের বিপদ আপদে তার পাশে দাঁড়ানোকে অনেক বড় পুণ্য হিসাবে বিবেচনা করে।

রমযানে রোযা পালনকারী ব্যক্তি ক্ষুধার্ত মানুষের কষ্ট অনুভব করে এবং ইফতার ও সেহরীতে খাদ্য দানের মাধ্যমে তাদের ক্ষুধা দূর করতে সহযোগিতা করে। রমযান মাসে যাকাতুল ফিতরা প্রদানের বাধ্যবাধকতা রোযাদারকে প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থীর আর্থিক কষ্ট লাঘবে এগিয়ে আসতে সাহায্য করে।

রমযান মাসে রোযা পালনকারী ব্যক্তিরা মহান আল্লাহর অপরিসীম রহমত প্রাপ্ত হওয়ার আনন্দে চারপাশের মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি নিজেরাও অনুগ্রহ ও দয়া সম্প্রসারিত করে। রমযান মাসে রোযাদারগণ আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির সুবাদে অন্য মানুষকে ক্ষমা করতে, তাদের দোষক্রুটি না ধরতে এবং তাদের ভুল ভ্রান্তি সংশোধনে উৎসাহিত হয়। রমযানে জাহান্নাম থেকে মুক্তির স্বাদ আস্বাদনকারী ব্যক্তি সমাজের অগণিত জাহান্নামগামী মানুষকে মুক্তির পথে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে।

বাবা-মা হারানো সন্তানকে বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে দুধ কলা আরাম আয়েশের মধ্যে লালন পালন করা মোটেও মানব সেবা হিসাবে বিবেচিত হয় না। বরং যে কোনভাবে যত দ্রুত সম্ভব তাকে তার বাবা-মার কাছে ফেরত দেয়াই তার জন্যে সর্বত্তোম সেবা।

একই বিবেচনায় মানুষের জন্যে সবচেয়ে বড় মানব সেবা হতে পারে, যে মানুষ তার বাড়ির ঠিকানা ভুলে গেছে, যে তার মালিককে হারিয়ে ফেলেছে, তাকে তার আপন ঠিকানায় ফেরত যাওয়ার ব্যাবস্থা করা। রমযান ঘরবাড়ি হারানো মানুষকে ঘরে ফিরিয়ে দেয়।

যে শয়তানের ছলনার জালে একদিন মানুষ তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, রমযান সে শয়তানকে বন্দি করে মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে সাহায্য করে। শত্রুর ফাঁদে পা দিয়ে মালিককে ছেড়ে যে মানুষ রাগে দুঃখে লজ্জায় অচল হয়ে যায়।

রমযান ক্ষমা ও ভালবাসার আচ্ছাদনে ঢেকে সে মানুষের সব দুঃখ লজ্জা ধুয়ে মুছে তাকে সসম্মানে ঘরে ফিরিয়ে আনে। যে বোকামি আর মূর্খতার কারণে সে মালিককে ভুল বুঝেছিল, সে সব বোকামি আর মূর্খতার নাগপাশ থেকে চিরমুক্তির সোপান হিসাবে রমযান তার হাতে তুলে দেয় আল কুরআন, যা তাকে সব ধরনের পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচাতে পারে। এখন আর তার কোন ভয় নেই। নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে আপন ঘরে বসবাস করতে পারে।

মানব সেবার জন্য করণীয়

- মানবিক হওয়ার চেষ্টা করুন। মানুষের পাশে দাঁড়ান। খাদ্য দিয়ে অর্থ দিয়ে ভালবাসা ও ক্ষমা দিয়ে সাহায্য করুন।
- মানুষের মৌলিক দাবীসমূহ পূরণে পাশে থাকুন।
- মাতাপিতা হিসাবে সন্তানদের দাবী পূরণ করুন।
- স্বামী-স্ত্রীর অধিকার প্রদানে পরস্পরকে সাহায্য করুন।
- আত্মীয়দের হক আদায়ে সচেষ্ট হোন।
- প্রতিবেশীদের ব্যাপারে যত্নশীল হোন।
- জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কালজয়ী মানব সেবার উজ্জল উদাহরণ স্থাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন।
- বিশ্বমানের সেবা সংস্থা গঠনে অবদান রাখুন।
- লোক দেখানো মানব সেবার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন।
- সালামের ব্যাপক প্রচার করুন।
- বোকামি ও মূর্খতা থেকে বেঁচে থাকুন।
- সব ধরনের স্বার্থপরতা স্বজনপ্রীতি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠুন। নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ মানবতার বন্ধু হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করুন।

- রক্তের সম্পর্ক বন্ধুত্ব ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকুন।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সম্ভব সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন।
- মাদকাসক্ত এইডস সহ্ সবধরনের মানবিক বিপর্যয় থেকে সমাজকে রক্ষা করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালনের চেষ্টা করুন।
- যৌতুক নারী ও শিশু নির্যাতন সহ্ যাবতীয় মানবতা বিরোধী কার্যক্রম বন্ধে উদ্যোগ নিন।
- যাকাত, ফিতরা ও দান সদকার ব্যাপারে নিয়তকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- যাকাত ফিতরা প্রদানকে নিজের উপরে বোঝা মনে করবেন না। এটা তাদের পাওনা হিসাবে বিবেচনা করুন।
- দারিদ্র্যতা দূরীকরণে ভূমিকা পালনের উদ্যোগ নিন।
- গতানুগতিক ও দায়সারাভাবে দান করা থেকে বিরত থাকুন।
- কাউকে সাহায্য সহযোগিতার সাথে কোনরকম প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা করা থেকে বিরত থাকুন।
- আত্মীয়স্বজন এলাকা বা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সমন্বিত সমাজ সেবা মূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ নিন।
- মানুষের দুর্দিন দুঃসময়ে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ উদ্ধারে কাজ করবেন না।
- ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করুন। মন্দ কাজ প্রতিরোধ করুন।
- যোগ্য ও দক্ষদেরকে সম্মান ও মূল্যায়ন করুন।
- সব ধরনের ভেজাল থেকে বেঁচে থাকুন।
- মৌলিক মানবীয় গুণাবলী অর্জনে সচেষ্ট থাকুন। মানবিক দুর্বলতা থেকে বেঁচে থাকুন।
- সর্বোপরি সকলকে তার স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে সাহায্য করুন। ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দিন। এটাই হলো সবচেয়ে বড় মানব সেবা।

রমযান মাস ও শয়তান

সৃষ্টিজগতের কত কিছুর সাথেই মানুষের সম্পর্ক। কারো সাথেই তার শত্রুতা নেই। একমাত্র শয়তান ছাড়া। যদিও মানুষ কখনও শয়তানের ক্ষতি করেনি, তবুও শয়তান মানুষর সর্বনাশ করার চেষ্টা করে। সুতরাং একজন মানুষকে অবশ্যই শয়তান সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা উচিত। পৃথিবীর সকল ধর্মে শয়তানকে মানুষের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমনকি ধর্মহীন মানুষও শয়তানকে ঘৃণা করে, তার হাত থেকে বাঁচতে চায়। তা সত্বেও শয়তান সম্পর্কেই মানুষের অজ্ঞতার সীমা নেই। মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থায় শয়তান সম্পর্কে তেমন কিছুই নেই। মুনষ কত কিছু জানে, বুঝে অথচ তার প্রকাশ্য দুশমন শয়তান সম্বন্ধে সে একেবারে অন্ধকারে ডুবে থাকে। এ এক অতীব ভয়াবহ অবস্থা। এ ব্যাপারে ইসলামী জ্ঞানের প্রধান উৎস আল-কুরআনই একমাত্র অবলম্বন যা শয়তান সম্পর্কে মানুষকে প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য উপাত্ত ও করণীয় সবিস্তারে বর্ণনা করে।

আদম - শয়তান সম্পর্ক

- সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু হলো শয়তান।
- সে আদমকে সেজদা করেনি।
- সে আদমের কৃতিত্ব ও সম্মান সহ্য করতে পারেনি।
- সে নিজেকে আদমের চেয়ে উত্তম দাবী করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা তার দাবী গ্রহণ না করে তাকে অবাধ্য ও অভিশপ্ত ঘোষণা করেন। তখন সে আদমকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করে এবং এ কাজে সুযোগ দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার অনুমতি প্রার্থনা করে।
- আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সুযোগ দেন। তখন থেকে সে আদমকে আল্লাহ্র অবাধ্য বানানোর প্রক্রিয়া শুরু করে।

আদমের ভূমিকা

এক্ষেত্রে আদমের কোন দোষ বা ভূমিকা নেই। সে পরিস্থিতির শিকার।

- আদম (আ.) নিজ থেকে বস্তুসমূহের নাম জানার কোন চেষ্টা করেননি। আল্লাহ্ তায়ালা নিজ থেকেই আদমকে (আ.) নামসমূহ শিক্ষা দিয়েছেন।
- আদম (আ.) শয়তানকে নাম শিক্ষা দিতে নিষেধ করেননি।
- শয়তান ও ফেরেশতারা তাঁকে সিজদা করুক এটাও আদম (আ.) দাবী করেননি।
- শয়তানকে তার অপরাধের জন্যে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছাও আদম (আ.) ব্যক্ত করেননি।

শয়তানের অবস্থা

এক্ষেত্রে শয়তানের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

- আল্লাহ্ যখন তাকে বস্তুসমূহের নাম বলতে বলেছেন, তখন সে নামগুলি বলতে পারেনি।
- সে আল্লাহ্র কাছে নামগুলি শিক্ষা দেয়ার অনুরোধ করেনি।
- সিজদা করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ পালন করেনি।
- ভুল স্বীকার করেনি।
- নিজেকে আদমের (আ.) চেয়ে শ্রেষ্ঠ দাবী করেছে। মনগড়া যুক্তি উপস্থাপন করেছে।
- আদমকে (আ.) ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেছে।
- আল্লাহ্র নিষিদ্ধ গাছ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য দিয়ে আদমকে (আ.) প্রতারিত করেছে।

আদমের বিরুদ্ধে শয়তানের প্রথম আক্রমণ

আল্লাহ্ তায়ালা আদমের (আ.) জন্য জান্নাতের যে বস্তু নিষিদ্ধ করেছিলেন, আদমের (আ.) মনে ঐ বস্তুর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে শয়তান আদমকে (আ.) ভুল করায়। আদম (আ.) ভুল বুঝতে পারেন ও মাফ চান। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে (আ.) মাফ করেন। আল্লাহ্ তায়ালা শয়তানকে আদমের (আ.) শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে আদমকে (আ.) পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে শয়তানসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

পৃথিবীতে আদমের বিরুদ্ধে শয়তানের কর্মপ্রক্রিয়া

শয়তান মানুষকে সুখ সমৃদ্ধি আনন্দ ফুর্তির টানে নিষিদ্ধ বস্তুর আকর্ষণে পাগল বানিয়ে ফেলে। তাকে বেসামাল করে রাখে। মানুষের সময় শক্তি ও সম্পদ শুধু আরাম আয়েশ ও ভোগ দখলের পেছনে লাগায়। মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ও অযৌক্তিক বাসনার ফাঁদে সে মানুষকে আটকে ফেলে। ভুল তথ্য দিয়ে সে মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যা বানায়। তার প্রতারণায় মানুষ অস্থায়ী দুনিয়াতে স্থায়ী হওয়ার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। পরকালের স্থায়ী আবাসের ধারণাকে ভুলে যায়, অস্বীকার করে।

শয়তান সূচনা করে হারাম খাদ্যবস্তুর মাধ্যমে, যা ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করে অবৈধ যৌনাচারের অভ্যাস এবং শেষ পর্যন্ত তা অন্যায় ভোগ বিলাস ও পৃথিবীতে স্থায়ী হওয়ার স্বপ্নে রূপ নেয়।

শয়তান থেকে আদমকে রক্ষা করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার ভূমিকা

তিনি আদমকে (আ.) প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন।

তিনি সবার সামনে আদমকে (আ.) দেখিয়ে দিয়েছেন যে গোটা সৃষ্টি জগতে একমাত্র শয়তানই তার প্রধান শত্রু।

শয়তান কিভাবে ক্ষতি করে তা হাতে নাতে প্রমাণ করেছেন।

আদমের (আ.) ভুল ক্ষমা করেছেন।

দুনিয়াতে শয়তানের হাত থেকে বাঁচার সকল কলা-কৌশল ও নিয়মনীতি আদমের (আ.) কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন।

তিনি নিজ ক্ষমতাবলে রমযান মাসে শয়তানকে আটক করে আদমকে (আ.) শত্রু-শূন্য অবস্থায় নির্বিঘ্নে তাঁর নিকট ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

রমযান হলো সেই মাস যখন মানুষ এক সুদীর্ঘ সময় শয়তানবিহীন থাকার বিস্ময়কর সুযোগ লাভ করে। রমযান হলো সেই মহিমান্বিত মাস যে মাসে শয়তান আক্রান্ত লাখো আদম শয়তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায়।

নানা প্রলোভনে শয়তান যাদেরকে বন্দি করে, সারা বছর তাদের দিকে শয়তান কড়া নজর রাখে যেন কোনভাবেই কেউ পালাতে না পারে। তার বিশ্বস্তদের দিয়ে পাহাড়া দেয়ায়। দরজা জানালা বন্ধ রাখে। তার আস্তানার নিরাপত্তার জন্য সে সব করে। তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালানো যায় না।

শয়তানের প্রতারণার বিষয় বুঝামাত্র বন্দীরা পালানোর জন্য চেষ্টা করে। কোন সচেতন বন্দীই সেখানে থাকতে চায় না। সামান্যতম বুদ্ধি বিবেচনা যার আছে সেও শয়তানের আস্তানা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ফন্দি ফিকির করে, উদ্যোগ প্রচেষ্টা নেয়। দু-চারবার ব্যর্থ হলেও আশা ছাড়ে না। যে কোন বড় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। নানাবিধ কলাকৌশল আবিষ্কার করে। রমযানই হলো সে বড় সুযোগ। শয়তানের অনুপস্থিতি টের পেয়ে বন্দীরা সব মুহূর্তের মধ্যে বেড়িয়ে পড়ে। এক নিঃশ্বাসে পৌঁছে যায় মুক্তির ঠিকানায়।

বছরের এগারটি মাস শয়তান থাকা অবস্থায় মানুষকে সে তার সম্পর্কে কিছু জানতে বুঝতে দেয় না। মানুষ ঘোর অন্ধকারে থাকে। ফলে তাদেরকে ধরা শয়তানের জন্য সহজ হয়। রমযান মাসে শয়তানের অনুপস্থিতিতে সে বাধা আর থাকে না। মানুষ শয়তানের পরিচয় তার কর্মপ্রক্রিয়া এবং তার হাত থেকে বাঁচার বিষয়াদি সম্বন্ধে জানতে পারে, বুঝতে পারে। সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারে। রমযানের কারণে মানুষের মধ্যে যে সচেতনতা সৃষ্টি হয় সে কারণে রমযানের পরে মানুষকে ভুল পথে নিতে শয়তানকে অনেক বেশি বেগ পেতে হয়। পুরো একটি মাস শয়তানমুক্ত জীবনের সুস্বাদ পাওয়া মানুষগুলো আর সহজে শয়তানের ফাঁদে পা দেয় না। এভাবে রমযান শয়তানের সফলতার পথে অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

রমযান মাস শয়তানের জন্য এক আতংকের মাস। কত মানুষ যে এ মাসে তার হাত থেকে পালাবে সে জানে না। রমযান তার সকল অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়। যে আদমকে দোযখে নিয়ে সে আনন্দ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়, সে আদম রমযানে দোযখ থেকে মুক্তি পায়। তার নির্বুদ্ধিতার জন্য তাকে এখন একাই দোযখে থাকতে হবে। হায় কি আফসোস। আদমকে দোযখী বানানোর কুবুদ্ধি কেন মাথায় এসেছিল? কেন আদমের পেছনে লাগলাম। সারা বছর আমার নিয়ন্ত্রণে থাকলেও রমযানে সে প্রভুর আশ্রয়ে চলে গেল। মুক্তি পেল। এখন আমার কি হবে ইত্যাদি বলে শয়তান আফসোস করে, কান্নাকাটি করে, আহাজারি করে।

শয়তানের ফাঁদে আটক সব বন্দী এক নয়

- কেউ কেউ মনের দুঃখে রাগে শোকে আত্মহত্যা করতে পারে।
- দু চারজন ভাবতে পারে বন্দি যখন হয়েছি আর কি করা। কপালের দোষ। কষ্ট দুঃখ যাই হোক শয়তানের সাথেই থাকি। শয়তানের দেয়া সুযোগ সুবিধা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করি। অতীতের সবকিছু ধীরে ধীরে ভুলে যায়।
- নিজেকে দোষারোপ করে, কেন তার ফাঁদে পা দিলাম, তার কথা শুনলাম ইত্যাদি ভাবে। খায় দায়, আফসোস করে, মনের দুঃখে হতাশায় ভোগে, কি করবে কিছুই বুঝে না।
- নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য রাগ করে। যে কোন প্রকারে পালানোর চিন্তা করে। চেষ্টা করে। ভয়ও করে। কারো সাথে আলাপ আলোচনা করে না। সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।
- হাবভাবই আলাদা। শয়তানের হাতে ধরা পড়ার পর থেকেই পালানোর জন্য সক্রিয়। ২/৪ বার চেষ্টাও করে। সুযোগ পাওয়া মাত্র যে পালাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার দিকে শয়তানের বিশেষ নযরদারি। সুযোগ পাওয়া মাত্র এক নিঃশ্বাসে আপন ঠিকানায় পৌঁছে যায়।
- শুধু নিজে শয়তানের হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করেই ক্ষান্ত নয়, বরং সবাইকে শয়তান থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে, বুঝায়, সাবধান করে, সাহস দেয়। পরামর্শ করে। বুদ্ধি আঁটে। সংগঠিত করে। দিনরাত পরিশ্রম করে, ফাঁক ফোঁকড় খোঁজে। সুযোগ পাওয়া মাত্র সবাইকে নিয়ে পালায়।

রমযানে শয়তান না থাকলেও শয়তানি হয় কেন?

এগারটা মাস ধরে মানুষের উপরে শয়তানের যে প্রভাব চলে, শয়তানের অনুপস্থিতিতে কিছুদিন সেটার রেশ চালু থাকতে পারে।

শয়তানের কাছ থেকে সুবিধা পাওয়া লোকজন শয়তানের অনুপস্থিতিতেও তার পথে চলতে চায়। শয়তানকে ছেড়ে যাওয়া তাদের জন্যে কতটা সুবিধাজনক হবে তা তারা বুঝতে পারেনা।

অনেক মানুষই শয়তানের মত ও পথকেই তাদের জন্যে সহজ ও সুবিধার বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে এবং শয়তানের দোসরে পরিণত হয় এবং তার অনুপস্থিতিতে তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার দায়িত্ব পালন করে।

রমযান মাসে শয়তান বন্দী থাকার প্রমাণ

- এ মাসে অনেক বেশি মানুষ কুরআন পাঠ করে।
- এ মাসে অনেক বেশি মানুষ নামাযী হয়।
- এ মাসে মানুষ বেশি দান-সদকা করে।
- এ মাসে মানুষ অনেক বেশি নফল নামায পড়ে।

- এ মাসে মানুষ শেষ রাতে সেহেরী খায়, তাহাজ্জুদ পড়ে, দুআ করে।
- এ মাসে ফজরের জামাতে বেশি লোক উপস্থিত হয়।
- এ মাসে চেইন ধূমপায়ীরাও দিনের বেলা ধূমপান করে না।
- এ মাসে ঝগড়া-ফাসাদ ও সামাজিক অপকর্ম কমে যায়।
- এ মাসে অনেক হোটেল-রেস্তোরা বন্ধ থাকে, বাকিরা পর্দা লাগিয়ে রমযানকে সম্মান করে।
- এ মাসে মানুষ খতম তারাবিহর মাধ্যমে অনেক দীর্ঘ নামায আদায় করে।

শয়তান থেকে বাঁচার জন্য করণীয়

- আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম পাঠ করুন এবং আল্লাহর আশ্রয়ে প্রবেশ করুন।
- নামাযের জামাতে কাতারে ফাঁক রাখবেন না। রসূল (স.) বলেছেন, কাতারের ফাঁকে শয়তান দাঁড়িয়ে মুসল্লিদের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেয়।
- বাসা-বাড়ীতে প্রবেশের সময় দুআ ও সালাম দিয়ে প্রবেশ করুন।
- খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে শুরু করুন এবং খাওয়া শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলুন।
- শোবার সময়ে আয়াতুল কুরসী ও নির্ধারিত দুআ পাঠ করুন।

  রসূল (স.) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি গৃহে প্রবেশকালে দুআ, সালাম না দেয়, তাহলে তার সাথে একজন শয়তান তার গৃহে প্রবেশ করে। যখন ঐ ব্যক্তি বিসমিল্লাহ না বলে খাদ্য গ্রহণ করে তখন শয়তান তার খাদ্যে অংশ নেয়। এবং ঘুমানোর সময়ে দুআ পাঠ না করলে শয়তান তার সাথে বিছানায় অবস্থান করে।
- রমযানে যেহেতু শয়তানকে চেনা-জানার পথে কোন বাধা থাকে না, সেজন্য শয়তানের পরিচয় তার কর্মপদ্ধতি ও তার আক্রমণ থেকে বাঁচার পথ ও কলাকৌশল সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন করুন।
- কুরআন ছাড়া আর কোন গ্রন্থ শয়তান সম্পর্কে সঠিক ও পরিপূর্ণ তথ্য দিতে পারবে না। অতএব রমযান মাসে ভালভাবে কুরআন অধ্যয়ন করুন। বিশেষভাবে শয়তান সম্পর্কিত আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস গুরুত্বসহ পাঠ করুন।
- আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে নিজের শক্তি-ক্ষমতায় শয়তানকে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সেজন্যে শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা করুন।
- শয়তানের ব্যাপারে অসাবধানতা যাবতীয় বিষয়ের সাবধানতা সত্বেও আপনার সর্বনাশ করার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিন।

রমযান মাস দামী এক মেহমান

একটু চিন্তা করুন, আপনার কাছে এখন সবচেয়ে দামী মেহমান কে? আগামী দু এক মাসের মধ্যে তাঁর আপনার কাছে আসার কথা। তাহলে এখন আপনার চিন্তা-চেতনা কাজ-কর্ম আচার-আচরণ কেমন হবে?

মেহমানের আসার সময় যতই ঘনিয়ে আসবে, আপনার যাবতীয় কার্যক্রমও সেভাবেই এগুতে থাকবে। আপনার পরিবার কর্মস্থল ও চারপাশের সবাই টের পাবে আপনার দামী মেহমান আসার ব্যাপারটি।

যে কোন মেহমানের ব্যাপারে আমাদেরকে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়। যেমন-

- **অভ্যর্থনা**
- **থাকার ব্যবস্থা**
- **খাওয়ার ব্যবস্থা**
- **বিনোদন ও আনন্দ ফুর্তির ব্যবস্থা**
- **উপহার সামগ্রীর ব্যবস্থা**
- **বিদায় সম্বর্ধনা**

প্রথমতঃ মেহমানের গুরুত্ব এবং তাঁর দামের উপর নির্ভর করে, এসব বিষয়ের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ মেজবানের সাধ্য ও সামর্থ অনুযায়ী এসব করা হয়।

আমরা যদি রমযান মাসকে খুব দামী মেহমান হিসাবে গণ্য করতে পারি তাহলে তার জন্য উপযুক্ত মেহমানদারী করতে সুবিধা হবে।

মেহমানের দাম মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্ধারণে যেসব বিষয় খেয়াল করা হয় সেগুলি হলো:

- আত্মীয়তার সম্পর্ক
- কর্মস্থলের দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা বস
- পেশাগত বিষয়ে সাহায্যকারী
- সামাজিক ঘনিষ্ঠতা

মেহমানদারী কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিষয় হতে পারে, আবার কখনও কখনও এটা বিশাল সামষ্টিক দায়-দায়িত্বও হতে পারে। বিদেশ থেকে আপনার খালাত ভাই আসছেন। ২-৪ দিন আপনার এখানে থাকবেন। পাশের বাসারও কেউ জানল না। তেমন কোন অসুবিধা হবে না। অন্যদিকে এলাকার এম পি সাহেব অথবা আপনার জেলার ডি সি সাহেব

অথবা কোন বিশেষ সাহায্য সংস্থার প্রধান আসছেন আপনার এলাকার কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে সহযোগিতার জন্য। এলাকার চেয়্যারমান অথবা আপনি একাকী তাঁকে নিজের বাসায় বসিয়ে আলাপ-সালাপ সেরে বিদায় দিলেন, তাতে কি লাভ হবে?

রমযান নামক যে মেহমান আসছেন তিনি একাধারে আপনার নিজের জন্য আপনার মত করে আপনার জন্য আসছেন, আপনার পরিবারের জন্য আসছেন আবার এলাকার সবার জন্যও আসছেন। সুতরাং তাঁর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত মেহমানদারীর ব্যবস্থা।

রমযান নামক মেহমানের জন্য করণীয়

- **অভ্যর্থনা** হলো তাঁর প্রতি আপনার বিশ্বাস, তাঁর সম্মান ও মান-মর্যাদার ব্যাপারে আপনার সচেতনতা। তাঁর বিষয়ে আপনার বুদ্ধি বিবেচনা আন্তরিকতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা। এক কথায় আপনার নিয়ত ও ইখলাস।

- **থাকার ব্যবস্থা** হলো আপনার কাজকর্ম। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনার নামাজের অবস্থা। আপনার নামাজ যত সুন্দর হবে মেহমানের থাকার ব্যবস্থা তত সুন্দর হবে।

- **খাওয়ার ব্যবস্থা-** রমযানের খাদ্য হলো কুরআন। কুরআন তিলাওয়াতের মান, কুরআনের অর্থ জানার অবস্থা, সূরা ও আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাৎপর্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং কুরআন শিক্ষা ও প্রচারে আপনার ভূমিকা নির্ধারণ করবে মেহমানের খাওয়া-খাদ্যের অবস্থা কেমন করেছেন।

- **বিনোদন ও আনন্দ ফুর্তির ব্যবস্থা-** মাহে রমযানের আনন্দ-ফুর্তি ও বিনোদন হলো আচার- আচরণ ও চরিত্রগত বিষয়াদি। যেমন- সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, ইত্যাদি।

- **উপহার সামগ্রীর ব্যবস্থা-** আমাদের রমযান মেহমানের জন্য উত্তম উপহার সামগ্রী হলো মানব সেবা ও সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ড।

- **বিদায় সম্বর্ধনা-** মাহে রমযানের বিদায় সম্বর্ধনা সাজাতে হবে অতি উন্নত মানের দুআ ও ইসতিগফার দিয়ে।

ঈদুল ফিতর

রমযান মাসের শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিতর। ইসলামে দুটি জাতীয় উৎসবের দিন হিসাবে নির্ধারিত। ঈদুল ফিতর একটি, অন্যটি ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ।

ঈদ অর্থ আনন্দ। ফিতর অর্থ স্বাভাবিক বা প্রকৃতিস্থ হওয়া। রমযান মাসে দিনের বেলা স্বাভাবিক পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা এবং রাতে দীর্ঘ তারাবিহ এবং সেহরী সহ যে অসাধারণ কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করা হয়, শাওয়ালের চাঁদ উঠার মধ্য দিয়ে তা শেষ হয় এবং মুমিনগণ স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে আসে। ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য বহুমাত্রিক।

মানুষ আল্লাহর গোলাম। গোলামের খুশির বিষয় হল তার প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পারা। যে গোলাম মনিবের আদেশে অসন্তুষ্ট হয় সে উত্তম গোলাম নয়। আর যে গোলাম মনিবের নির্দেশ পালন করতে আনন্দ পায় তৃপ্ত হয় সে সর্বোৎকৃষ্ট গোলাম। মানুষের উপর আল্লাহ তায়ালার এক মহান হুকুম হল রমযানের রোযা পালন করা। প্রতিটি গোলাম পুরো একটি মাস অক্লান্ত শ্রম দিয়ে স্বীয় প্রভুর নির্দেশ পালনে সচেষ্ট ছিল। যে দিন শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেল, সে দিন মানুষ বুঝল যে আমি আমার প্রভুর নির্দেশ পরিপুর্ণরূপে পালন করতে পারলাম। তখন সে নিজ থেকেই আনন্দ বোধ করে। একটি বড় কঠিন কাজ সঠিকভাবে করতে পারার আনন্দে উৎফুল্ল হয়।দীর্ঘ একটি মাস অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সঠিকরূপে রোযা পালন চাট্টিখানি কথা নয়।

রমযান মাস ছিল বান্দার কাজের মাস। আর প্রত্যেকেই কাজ শেষ করে কিছু বিনিময় পেতে চায়। আল্লাহ তায়ালাও বান্দাকে প্রতিটি কাজে সত্তর গুণ বিনিময় দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে রমযানে রহমত দিয়েছেন, ক্ষমা করেছেন ও দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই যে বান্দার এত বিরাট পাওয়া এতে তার অবশ্যই আনন্দ আসবে। বান্দার এ পুরস্কার পাওয়ার আনন্দের বহিঃপ্রকাশই হল ঈদ। যেমন একজন ভাল ছাত্র ভাল রেজাল্ট করে খুশি হয়, আনন্দ প্রকাশ করে। সকলের সাথে সাক্ষাৎ করে সংবাদটি জানায়। শুভ সংবাদ গোপন করে রাখতে চায় না কেউ। অন্যদিকে দুঃখের কথা প্রচার করা হয় না। ভাল বিষয় সাফল্যের কথা যত বেশি প্রচার করা হয়, যত বেশি মানুষের সাথে শেয়ার করা হয়, আনন্দ ও খুশির পরিমাণ তত বাড়ে অথচ খারাপ সংবাদ কেউ জানলে কষ্ট বাড়ে।

সকালে ঈদের মাঠে আল্লাহ তায়ালা যখন বান্দার পরিশ্রমকে কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা দেন তখন বান্দাহ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত হয়। তার আনন্দের শেষ থাকে না।

সামাজিক অবস্থানে এবং পেশাগত কারণে একেক মানুষ একেক এলাকায় বসবাস করে। বিভিন্ন কাজে মানুষ ব্যস্ত থাকে। আত্মীয় স্বজন, ভাই-বোন, বাবা-মা সকলেই সব সময় একত্রিত হতে পারে না। ঈদকে কেন্দ্র করে সকলেই একত্রিত হওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়াও ঈদ সমাজের পরস্পরের অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা করে। যাকাত ও ফিতরাসহ দান সাদকার মাধ্যমে নিজের সম্পদে সমাজের অন্যদের যে হক ছিল ঈদুল ফিতর উপলক্ষে তা আদায় করতে পারারও আনন্দ উপভোগ করা যায়।

ঈদে করণীয়

- শওয়ালের চাঁদ দেখে দুআ করুন। সদ্য মুক্ত শয়তানের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নিন।
- রমযান শেষে নতুন চাঁদ দিয়ে যে শওয়াল মাস শুরু হয়, ঐ রাতই ঈদ রাত। এর সম্মান মর্যাদা রক্ষায় সর্তক থাকুন।
- ঈদ রাতে মাগরিব ও এশার নামায কোনভাবেই বাদ দিবেন না এবং জামাতে পড়বেন।
- ঈদের দিন ফজর নামায জামাতে পড়ুন।
- ঈদের দিন ফজর থেকে ঈদের নামাযের মধ্যখানে অন্য কোন নফল-সুন্নত নামায পড়বেন না।
- ঈদের দিন সকালে গোসল করুন।
- ভাল পোশাক পরিধান করুন। সুগন্ধি লাগান।
- ঈদগাহতে যাওয়ার আগে মিষ্টি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করুন।
- ঈদগাহ / মসজিদে গমন করুন।
- এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে গমন করুন, অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসুন।
- বেশি বেশি তাকবীর পড়ুন।
- মনোযোগসহ খুতবা শুনুন। খুতবা শেষ না করে ঈদগাহ/মসজিদ থেকে চলে আসবেন না।
- ইমামগন সুন্দর আকর্ষণীয় খুতবা প্রস্তুত ও পাঠ করুন।
- ঈদের দিন যোহর - এশা প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায জামাতে পড়ুন।
- পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানান।
- মহিলা ও শিশুদেরকে ঈদের মাঠে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিন।
- বৃদ্ধ ও দুঃস্থ এবং দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন অথবা মনোমালিন্যের কারণে যোগাযোগ বন্ধ আছে এমন আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাত করুন।

রমযানের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা

উপযুক্ত প্রস্তুতি ও সঠিক পরিকল্পনার উপরে যে কোন কর্মসূচীর সাফল্য নির্ভর করে। রমযানের যে ব্যাপক কার্যক্রম তার সফলতার জন্যেও প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

রমযান নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াতে 'আইয়ামাম মাঅদুদাত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'আইয়ামাম মাঅদুদাত' এর সরল অর্থ হলো মাত্র কয়েকদিন, হাতে গোনা কয়েকদিন, সামান্য কটি দিন, নির্দিষ্ট কয়েকদিন ইত্যাদি।

এখান থেকে বুঝা যায়, মুসলমানগণ মুত্তাকী হওয়ার জন্য হাতে গোনা গুটি কয়েক দিনের একটা সুযোগ পায় রমযান মাসে। এটা কোন সীমাহীন সুযোগ নয়। অগনিত অসংখ্য দিনের জন্য সুযোগটা আসে না। হিসাবের সময় ও সম্পদ, হিসাব করেই খরচ করে সবাই। সুতরাং রমযানেও হিসাব করে বুঝে শুনে সঠিক পরিকল্পনা এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও পর্যালোচনা করে এগোতে হবে। আলস্য অবহেলা করলে চলবে না।

রসূলুল্লাহ (স.) এর দুটি হাদীসও রমযানকে সফল করার ব্যাপারে প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়।

একটি হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর দৃঢ় আস্থা ও আত্মসমালোচনাসহ রমযান মাসের রোযা রাখে, তার সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।" আবার "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর দৃঢ় আস্থা ও আত্মসমালোচনাসহ রমযান মাসের রাতে জেগে ইবাদত করে, তার সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"

'ইহতিসাবান' শব্দের অর্থ হল হিসাব, আত্মসমালোচনা, পর্যালোচনা, সাওয়াব বা লাভ ইত্যাদি। এর মাধ্যমে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি রমযানকে উপযুক্ত প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী পালন করা উচিত।

অন্য আরেকটি হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের এই মাসটি (রমযান) তোমাদের উপর ছায়াপাত করেছে। মুসলমানদের উপর দিয়ে এর চাইতে উত্তম কোন মাস অতিক্রম করেনি। আর মুনাফিকদের জন্য এর চেয়ে মন্দ কোন মাস অতিক্রম করেনি। তিনি (স.) আরো বলেছেন যে, মুসলমানদের জন্য এ মাসের আগমনের পূর্বেই এর পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। এটা এজন্য যে, মুমিন এ মাসের ইবাদতের জন্য পূর্ব থেকেই আহার্য সঞ্চয় করে প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। আর মুনাফিক ব্যক্তি মুমিনদের অসতর্ক মুহূর্তের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও

তাদের দোষ ধরার প্রস্তুতি নিতে থাকে। অতএব এটি এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ, মুমিন যার সদ্ব্যবহার করে থাকে। (আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব)

এখান থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে প্রকৃত মুমিনগণ রমযানকে সফল করার জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়, পরিকল্পনা করে। শুধু তাই নয় যারা এ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনাকে অবহেলা করে তারা মুনাফিক। তারা কখনও রমযানকে সুন্দরভাবে পালন করতে চায় না।

বাস্তবেও দেখা যায়, যারা বৈষয়িকভাবে রমযান থেকে ফায়দা উঠাতে আগ্রহী তারা অনেক আগ থেকেই হিসাব শুরু করে, মাঠেও নেমে পড়ে। যেমন, রমযানে বাজারের অন্যতম চাহিদা চাল, ডাল, তরিতরকারি, মাছ, গোশ্‌ত, চিনি, তেল, মুড়ি, ছোলা, দেশী ফল-মূল ইত্যাদী। যেসব ব্যবসায়ী এগুলির সাথে জড়িত তারা ২/৩ মাস পূর্বেই তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। বিদেশ থেকে মালামাল আনার জন্যে, ৩-৪ মাস আগেই এলসি করে। পেশাভিত্তিক সংগঠনগুলি একাধিক বৈঠক করে। গতবারের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে। কাপড়-চোপড়ের ব্যবসায়ীরাও যাকাতের জন্য বিশেষ মানের কাপড়সহ ঈদের স্পেশাল ডিজাইন অনুযায়ী কাপড় তৈরি সম্পন্ন করে বাজারজাত করা শুরু করে। এমনকি ঈদের নাটক ও সিনেমার প্যাকেজ সম্পূর্ণ করে প্রচারের অপেক্ষায় থাকে। সাহিত্যিকরাও একাধিক পত্রপত্রিকায় ঈদের লেখা জমা দিয়ে প্রকাশের দিন গুণে। রমযান শুরুর বেশ আগে থেকেই পত্র পত্রিকায় খাদ্য-পানীয়সহ আসবাবপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর বিজ্ঞাপন দেয়া শুরু হয়। রমযান উপলক্ষে কুরআন হাদীস বিক্রি হয়। সে হিসাবে কুরআন হাদীস বিক্রেতা ও প্রকাশকেরা ব্যবসায়ীদের সাথে মাঠে নামে। মসজিদে মসজিদে তারাবিহর হাফেজ নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইফতার সেহরীর সময়সূচী দিয়ে লিফলেট পোস্টার ছাপানো হয়। যাকাত ও ফিতরার বিষয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার প্রক্রিয়া দেখা যায়।

এর কোন একটি ব্যাপারে ২/৩ মাস এমনকি স্থানভেদে ১০/১২ মাস আগ থেকে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা-পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে কেউই দোষণীয় বা অপ্রয়োজনীয় বলে না। বরং কারও উদ্যোগ দেখলে সাধুবাদ দেয় এবং নিজেরাও উৎসাহিত হয়।

অথচ প্রকৃত রমযান প্রেমিক বলতে যাঁদের বুঝায় তাঁদের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নযরে আসেনা। তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংহতি সখ্যতার উন্নতি করা এবং এবারের রমযান থেকে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশী সফলতা অর্জনে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি চোখে পড়ে না। তাদের এ অবহেলার সুযোগ নিয়ে বস্তুপ্রেমিকেরা বাজার গরম করে ফেলে। তাদের একতরফা সমন্বিত ও পরিকল্পিত আক্রমণে রোযা নামায ইফতারী সেহরী তারাবিহ তাহাজ্জুদ দান সদকা যাকাত ফিতরা সব কিছু দুনিয়াবি বস্তুগত লাভ-লোকসানের দুষ্ট চিন্তার অধীনে চলে যায়।

এছাড়াও ব্যস্ততা, সময়ের অভাব, রমযান আসতে এখনও অনেক দেরী, এখনই ভাববার দরকার নেই, এসব ধারণার ভিতর দিয়ে কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই তারা মহিমান্বিত রমযানের ভিতরে প্রবেশ করে এবং গতানুগতিকভাবে রমযান উদযাপন করে।

রমযান উদযাপনের প্রকৃত অবস্থা ও বাঁচার উপায়

অধিকাংশ রমযান উদযাপনকারীর রমযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকে না। সে তার পরিচয় জানে না, তার স্রষ্টাকে চিনে না, তার শত্রুকে জানে না।

কুরআন পড়তে পারে না, কুরআনের অর্থ বুঝে না, সে অনুযায়ী জীবন চালায় না। ফলশ্রুতিতে আমল-আখলাকের কোন উন্নতি হয় না। দেশ জাতি ও দ্বীনের জন্য সময় সম্পদ ও শক্তি-ক্ষমতা ব্যয় করে না। আর দশজন মানুষের মত রোযা তারাবিহ তাহাজ্জুদ পালনকারীরাও বস্তুর আকর্ষণে ছুটে চলে। বস্তুর দাম বাড়ে। বস্তু অর্জনের প্রতিযোগীতা বাড়ে, পাপ বেশি হয়। আল্লাহ-রসূলের দিক নির্দেশনার তোয়াক্কা না করে রোযা, নামায, যাকাত, ফিতরা ঈদ সবকিছু নিজে যে ভাবে চায় সেভাবে পালন করে। রমযানের শুরুতে যে অগণিত মুসল্লি মসজিদে আসে রমযান শেষ হওয়ার আগেই তারা উধাও হয়ে যায়। রমযান নিয়ে আর কারোরই কোন আগ্রহ অবশিষ্ট থাকে না। রমযানের সুফল কারোও চোখে পড়ে না।

পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির জন্য করণীয়

প্রত্যেক রমযান উদযাপনকারীকে রমযানের গুরুত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। এবং রমযান থেকে যা কিছু অর্জন করতে হবে সেগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। যেমন- তাকওয়া, নামায, রোযা, কুরআন, দুআ, ইফতার, সেহরী, ইতিকাফ, রাত্রি জাগরণ, আখলাক ও চরিত্র, আচার-আচরণ, মানব সেবা, মানব ঐক্য, ঈদ ইত্যাদি।

- রমযান মাসকে বরণ করার জন্য শারীরিক মানসিক ও আত্মিকভাবে প্রস্তুতি নিন।
- রজব মাস থেকে প্রস্তুতি নিন।
- রমযানকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র করুন এবং ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করুন।
- রমযান সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জনসংযোগ করুন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মসজিদ ভিত্তিক কার্যক্রম, প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক ও গণমাধ্যম কেন্দ্রিক প্রচারের উদ্যোগ নিন।
- গতবারের রমযান কার্যক্রম পর্যালোচনা করুন।
- রমযানের ২৯/৩০ দিনের একটি কর্মপরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলুন।
- চাঁদ দেখার চেষ্টা করুন। রজব ও শাবানের চাঁদও দেখার উদ্যোগ নিন।
- চাঁদ দেখে দুআ করুন।
- রমযানকে স্বাগত জানান।
- আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও তাঁর শুকরিয়া আদায় করুন।
- প্রথম প্রহর থেকেই রমযানকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিন।
- সওয়াবের কাজে প্রতিযোগিতা করুন।

কিছু কথা ! কিছু দুআ !

শেষ কামড়

শয়তান জানে, রমযানে এক মাসের জন্য তাকে বন্দি করা হবে। সারাটা বছর সে নিরলস পরিশ্রম করে যে বিশাল মানবগোষ্ঠীকে তার বন্দিশালায় আটকে রেখেছে, রমযানে তার বন্দিত্বের সুযোগে এরা সবাই পালিয়ে যাওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করবে। মানুষ যেন পালাতে না পারে সেজন্যে সে অনেক আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সে তার প্রতারণার কাজে খুবই সচেতন ও বিচক্ষণ। তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সে কোন ত্রুটি করে না। যেহেতু রসূলুল্লাহ (স.) রজব থেকেই রমযানের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন, সেহেতু এটা অনুমান করা চলে যে শয়তান রজব থেকেই তার বন্দীদের রমযানে পালানোর সব পথ বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। সে পরিক্রমায় শাবানের শেষ রাতে সে সর্বশেষ মরণ কামড় দেয়। মানুষের বোধ শক্তি চিন্তা শক্তি ও শারীরিক ও মানসিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে এক মাসের জন্য অকার্যকর করে দিতে সে দ্বিধা করে না। অতি উচ্চ শক্তির চেতনানাশক প্রয়োগ করে। বন্দীদের মন মগজ অবশ করে দেয়, ফলে হাত-পায়ে বল থাকে না, মাজা-কোমড় সোজা করতে পারে না। চোখ খুলতে পারে না, কানে শুনে না, নাক বন্ধ ইত্যাদি। একদম মাস খানেকের জন্য অজ্ঞান অক্ষম করে দেয়। রমযান মাস আসে, তাদের ঘুম ভাংগে না। কিছুই টের পায় না, বোঝে না। নাওয়া খাওয়া নেই, নড়াচড়া নেই। বেহুঁশের মত শুধু ঘুমায়। রমযান বিদায়ের ২/১ দিন আগে দু চার জনের প্রতিক্রিয়া কমে আসলেও তাতে কাজ হয় না। রমযানের বিদায়ে শয়তান ফিরে আসে। দেখে মানুষ এখনও ঔষধের প্রতিক্রিয়ায় পড়ে আছে। সে আনন্দিত হয়। তার খুশি দেখে কে?

বন্দী মুক্তির কর্মী চাই

গোটা বন্দীশালার সবাই অজ্ঞান। কেবল একজন কেমন করে যেন বেঁচে গেছে। সে দেখল, গেইটে দারোয়ান নেই, দরজা খোলা। এক পা দুপা করে বাইরে আসে, এদিক সেদিক তাকায়। যখন বুঝে দারোয়ান কোথাও নেই, তখন সে চিৎকার করে সবাইকে উঠানোর চেষ্টা করে। কাউকে ধাক্কা ধাক্কি করে, কারও গায়ে পানি ঢেলে দেয়, কারও বুকে চাপ দিয়ে দম ফিরানোর চেষ্টা করে। দু-চার জন জেগে উঠলে তাদের সহায়তায় অন্যদেরকেও জাগিয়ে তোলে, প্রয়োজনে ডাক্তার এনে বেশি আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। দূর দূরান্তের এবং দুর্বল অক্ষম ও বৃদ্ধ বন্দীদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করে। খাদ্য ও পানীয়ও লাগতে পারে কারো কারো। এজন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। সেটারও ব্যবস্থা করে। দারোয়ান ফিরে আসার পূর্বে মাত্র ২৯-৩০ দিনের এ সুযোগটাকে সে পূর্ণরূপে কাজে লাগায়। একজন বন্দিকেও এখানে রেখে সে চলে যায় না। যেভাবেই হোক সব বন্দীকে সে মুক্ত করে।

প্রত্যেক বন্দীশালায় এরকম অন্ততঃ একজন কর্মী থাকলেও সবার মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা যেন এতটা হতভাগ্য না হই যে, কোন বন্দীশালায় এরকম একজন কর্মীও নেই। সবাই যদি অজ্ঞান হয়ে থাকে, রমযান চলে যাবে। হুঁশ ফিরবে না। দারোয়ান ফিরে আসবে, দরজা আবার বন্ধ হবে। আমরা আবারও ১১ মাসের জন্য বন্দীই হয়ে থাকব। এজন্য প্রত্যেক বন্দীশালায় অন্ততঃ একজন বুদ্ধিমান চালাক চতুর মানুষের প্রয়োজন। যিনি যে কোনভাবে শয়তানের অজ্ঞান করার পদক্ষেপ থেকে কৌশলে বেঁচে থাকতে পারেন।

একটু চেষ্টা করুন, আরও দু চার জনকে কানে কানে বা ইশারা ইংগিতে শয়তানের অজ্ঞান করার ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন। আপনি কি করবেন, সেটা বলুন। তাদেরকেও তৈরি করুন। আপনার একার পক্ষে এতগুলো অজ্ঞান মানুষকে জাগিয়ে তুলে বাড়িতে পৌঁছে দেয়া কষ্টকর হতে পারে। সময় শেষ হয়ে যেতে পারে। ঝামেলায় পড়তে পারেন। নিজে পরিশ্রান্ত অসুস্থ হতে পারেন। সেজন্যে আপনার সহযোগী সঙ্গী প্রয়োজন। সবাই যেন অজ্ঞান না হয় সে ব্যাপারেও চিন্তা ফিকির করুন। দু চারজন সঙ্গী পেলে আপনার সাহস বৃদ্ধি পাবে। কাজ সহজ হবে। সবাই পালাতে পারবে।

দ্রব্যমূল্য

অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ী বাজারে যখন কোন জিনিসের চাহিদা বেশি থাকে কিন্তু সরবরাহ কম থাকে, তখন ঐ জিনিষের দাম বেশি হয়। আবার যদি চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি হয় তাহলে সে জিনিষের দাম কমে।

এ পৃথিবীতে যে কোন বস্তুর পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কোন বস্তুর জন্য মানুষের চাহিদা যদি বেশি হয়, তখন তার দাম বৃদ্ধি পায়। সীমিত বস্তু সীমাহীন চাহিদা প্রচন্ড প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতা যত বাড়ে, তত গন্ডগোল হয়। যত গন্ডগোল তত পাপ।

শয়তান মানুষের বস্তুগত চাহিদা সীমাহীন করে দিতে চায়। রোযা মানুষের সীমাহীন চাহিদাকে সীমিত করে। রমযান মাসে রোযাদারগণ বস্তুর ব্যবহার কমাবেন, বাজারে চাপ কমবে, দ্রব্যমূল্য আগের তুলনায় নীচে নামবে। দরিদ্র অভাবীরা একটু আয়েশে কেনা কাটা করবে। এটাই হলো আদর্শ। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইফতারী সেহরীর আইটেম সংগ্রহে সবাই হুমড়ি খেয়ে বাজারে যায়। দাম বৃদ্ধির আশংকায় ৩০ দিনেরটা একদিনে কিনে। বাজারে সাপ্লাই কম। দাম দু-দশ গুণ। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যে আগুন। সাধারণ ও মধ্যবিত্তের অবস্থা বেগতিক। এটা সামাল দিতে শয়তান আয় বাড়ানোর যৌক্তিকতা দেখিয়ে মাঠ গরম করে। ভাল ইফতার ও সেহরী যোগাতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের নিত্য নতুন অবৈধ কৌশল আবিষ্কার করে। এক রোযাদার এক জায়গায় ঠকে, অন্য জায়গায় তিনি আবার অন্য রোযাদারকে ঠকায়। রমযান রোযা ইফতারী সেহরী নিয়ে শয়তান এক বিচিত্র খেলায় মেতে উঠে।

"রোযা আমার জন্য এবং আমিই এ পুরষ্কার দিব।" আল্লাহর তায়ালার এ কথার প্রতি আস্থা রেখে তাঁর কাছ থেকে পুরষ্কারের আশায় যারা রোযা পালন করে তারা কোনক্রমেই অতিরিক্তি মুনাফার লোভে বাজার অস্থিতিশীল করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অপচেষ্টা করার কথা নয়।

বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দ্বিগুণ-দশগুণ লাভ করে সে টাকায় ভাল ইফতার সেহরী আর ঈদের কেনাকাটা এবং মসজিদে বড় অংকের চাঁদা দিয়ে যে আল্লাহর দরবারে কোন ফায়দা হবে না সেটা একজন সাধারণ মুসলমানও জানে। এক্ষেত্রে ক্রেতা সাধারণও অনেক কিছু করতে পারে।

যেমন যে সব জিনিসের দাম রমযানে বাড়ে, সেগুলির প্রতি অযথা আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে সে। বস্তুগত বিষয়াদির ব্যবহার কমিয়ে বাজারে অযথা চাপ বৃদ্ধি ঠেকাতে পারে।

ঈদ ও স্টাইল

ঈদের চুল স্টাইলে মডেল কারা? তারা কি রোযা নামাযের ধার ধারে? একজন রোযাদার নামাযী ঈমান আমলহীন লোকের ষ্টাইলে চুল কাটবে কেন? আল্লাহ্‌র রসূলের চুল কাটার স্টাইলটা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না বুঝি? হাশরের মাঠে এই ষ্টাইলে চুল নিয়ে রসূলের শাফায়াতের জন্য দাঁড়াতে পারবেন তো? খেয়াল করুন।

সম্পাদক সাহেব, ঈদের পত্রিকার কোন বিষয় আল্লাহকে খুশি করার নিয়তে করেছেন? সংবাদ যে বিজ্ঞাপন বা প্রবন্ধ আল্লাহ ও রাসূলের খুব পছন্দ হবে এমন মনে করেই ছাপিয়েছেন নিশ্চয়ই। যদি এর উল্টা হয়, রোযা রেখে এসব কেন করছেন? আপনার হাত দিয়ে এসব প্রচার পরকালে রোযার শাফায়াত থেকে আপনাকে মাহরুম করে দিবে। সাবধান হোন।

নাটক সিনেমার প্রযোজক অভিনেতা ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলি ঈদ উপলক্ষে যা করছেন তাতে কি আল্লাহ ও রসূল খুশি হবেন? তা না হলে সেগুলো একজন মুসলমানের কাছে ঈদের বিষয় হয় কেমন করে? বিষয়বস্তু সাজগোজ উপস্থাপনা কোথাও তো সামান্যতম সাবধানতার ছাপ নেই। এ নাটক সিনেমা যদি হাশরের মাঠে উপস্থিত দর্শকদের সামনে দেখানো হয় তাহলে আপনারা কি খুবই উপকৃত হবেন? দয়া করে সাবধান হোন। রোযাদার ঈমানদার দর্শকরাও এসব দিয়ে ঈদ উপভোগ করেছেন। হাশরের মাঠে এটা সবাইকে দেখানোর সাহস পান?

ঈদের কবিতা গান গল্প এগুলির রচয়িতাগণের লক্ষ্য কি আল্লাহ ও রসূলকে খুশি করা? না মানুষকে আনন্দ দেয়া। যে আনন্দে আল্লাহ রসূল শরীক থাকে না সেটা ঈদ আনন্দের বিষয় হতে পারে না। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন। সংশোধন হোন।

ঈদে কোথায় আড্ডা দিবেন ঠিক করেছেন? কাদের সঙ্গে আড্ডা, কিসের আড্ডা। সে আড্ডাতে আল্লাহ রসূল অংশ নিতে পারবে তো? সারাটা রমযানের দিন রাত আল্লাহ রসূলকে নিয়ে কাটিয়ে ঈদের দিন তাদেরকে বাদ দিয়ে কিভাবে আড্ডা জমাবেন? ঈদের দিন কিন্তু শয়তানও আড্ডা বসায়। একটা মাসের বন্দীত্ব থেকে মুক্তির আনন্দ। এত চড়াই উৎড়াইয়ের পরেও যারা তার সম্বন্ধ ছেড়ে যায়নি, তাদেরকে নিয়ে শয়তানের আড্ডা ভালই জমে ওঠে। একজন রোযাদার সেখানে অংশ নিতে পারে না।

পরিবহন মালিকরা ঈদ উপলক্ষে ভাড়া বাড়াচ্ছেন। যাত্রী কম হলে আয় কম হয়। ঈদের সময় তো উপচে পড়া ভীড়। এমনিতেই অতিরিক্ত যাত্রী, অতিরিক্ত ট্রিপ, অতিরিক্ত আয়। এরপরেও যাত্রি প্রতি বর্ধিত ভাড়া নিচ্ছেন কেন? কালোবাজারে টিকিট দেয়া সহ যাত্রীদেরকে হয়রানি করার যত ফন্দি ফিকির সম্বন্ধে রমযান ঈদের মালিক হাশরের মাঠে প্রশ্ন করলে কি জবাব দিবেন ঠিক করেছেন তো?

সওয়াব ঝরার ঝড়

রমযান মাসে মহান আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে প্রচুর সওয়াবের অধিকারী করতে চান। এ সুযোগ দীর্ঘস্থায়ী নয়। ঝড়ের মত এটা আসে আবার হঠাৎই থেমে যায়। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই সওয়াব কুড়াতে হয়। সময়ে না কুড়ালে পরে আর সুযোগ থাকে না।

ঘরে বসে থাকলে চলবে না। ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুতের চমক সব কিছুকে উপেক্ষা করেই আম কুড়াতে হবে। আমের সিজনে একজন আম ব্যবসায়ীর কার্যক্রমের দিকে লক্ষ্য করুন। ট্রাকের পিছনে রাত জেগে চাঁপাই নবাবগঞ্জ পৌছান ভোর বেলা। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্ধ্যার পর পর আম বোঝাই ট্রাক নিয়ে রওয়ানা হন ঢাকার উদ্দেশ্যে।

সকাল ৭-৮ টায় আড়তে পৌছেই দ্রুত আনলোড করার ব্যবস্থা করেন। সন্ধ্যার পর আবার রওয়ানা হন চাঁপাইনবাবগঞ্জ। এভাবে চলতে থাকে ঢাকা-চাঁপাই ট্রিপের পর ট্রিপ। যত ট্রিপ তত লাভ। এটাই তাকে নাওয়া খাওয়া, ঘুম বিশ্রাম হারাম করে আমের পিছনে লেগে থাকতে সাহায্য করে। শক্তি জোগায়। বছরের অন্য সময়ে যে লোকটি অলস অযোগ্য বদনামের ভাগী হয়। সে আমের সিজনে অনেক বেশি কর্মঠ ও পরিশ্রমী হয়ে উঠে। সারা বছরের অর্জন সে করার চেষ্টা করে ২-৩ মাসের আম সিজনে। অন্য সময় বসে শুয়ে খেলেও তেমন সমস্যা হয় না। বিপদে পড়ে না। আমের সিজন শুরু হওয়ার ২-৪ মাস আগ থেকেই তার মধ্যে পরিবর্তন আসে। নড়েচড়ে ওঠে, গোছগাছ শুরু করে। মাজায় গামছা বাঁধে। কঠিন পরিশ্রমের জন্য তৈরি হয়।

আল্লাহ প্রিয় মানুষদের জন্য রমযান মাস আম সিজনে আমের ব্যবসায়ীর চেয়েও প্রিয়। কি খেল, কোথায় ঘুমালো, গায়ের গেঞ্জি, পায়ের স্যান্ডেল কোনদিকে খেয়াল নেই। বউ বাচ্চা আত্মীয় কুটুমের খবর নেই। দিন রাত শুধু আম দেখে, যত ট্রিপ তত টাকা গোনে। এই ধাঁধা তাকে অকল্পনীয় দুঃখ কষ্ট হজম করে লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে। মৌসুম শেষে ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন দেহ আরামের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে।

মানব ঐক্য

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। কাজকর্ম ও আচার আচরণের মাধ্যমে মানুষ এক আল্লাহর বড়ত্ব ও মহিমা গোটা সৃষ্টির সামনে তুলে ধরে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো মানুষের মধ্যে ভাঙ্গন, দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প সাহিত্যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হলেও বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে বিভেদও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতিগত দিক থেকে নানা রকম তারতম্য হয় মানুষে মানুষে। পুরুষ-মহিলা, সাদা-কালো, ভাষাগত পার্থক্য, পেশাগত ভিন্নতা, খুব স্বাভাবিক বিষয় হলেও এসবের ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষ অনেক বৈষম্যের শিকার হয়। এর সাথে যোগ হয় রাজনৈতিক, ভৌগলিক, ও আর্থিক অবস্থান ভিত্তিক জাতি-গোষ্ঠীর বিরোধ। তাছাড়া রয়েছে ধর্মীয় দলাদলি।

বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলির কারণে মানুষ নিজেই বিভিন্নমুখী স্রষ্টার অনুসরণ করে। ফলে সমাজে নানা স্রষ্টার অস্তিত্ব রূপ লাভ করে। সাধারণ জনগোষ্ঠী তখন এক আল্লাহকে খুঁজে পায় না। আর বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠি তখন এক ও অভিন্ন একক আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের বানানো আল্লাহর দিকে মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট থাকে। তারা নিজেদের স্বার্থে আল্লাহ্ তায়ালাকে তাদের মত করে উপস্থাপন করে প্রচার করে প্রতিষ্ঠিত করে। এভাবে পৃথিবীতে নানা দেশে নানা সময়ে বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ে বিভিন্ন ধরনের স্রষ্টার সৃষ্টি হয়।

এ অবস্থা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো এক আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর জাত সিফাত ক্ষমতা ও অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরই প্রেরিত বাণীর প্রতি গোটা মানবজাতির ফিরে আসা। শুধু তাঁর কথাকেই গ্রহণ করা। অন্য আর কারো বক্তব্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।

মানুষ যদি স্রষ্টার ব্যাপারে একমতে আসতে পারে, তাহলে জীবনের বাকি বিষয়াদির ব্যাপারেও একমত হওয়া সহজ হয়। এক্ষেত্রে রমযান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রথমতঃ এক ও একক আল্লাহর বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন নিয়ে এসেছে। মানুষ আল্লাহর জাত সিফাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও নির্ভুল তথ্য লাভ করে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে তা মেনে নেয়। আল্লাহ সম্পর্কে সকল সন্দেহযুক্ত ও কুসংস্কারপূর্ণ মত ও ধারণা থেকে মানুষ মুক্ত হয়। সকল মানুষ নির্ভেজাল একক প্রভুর অধীনস্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ রমযান মাসে রোযা দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্মকান্ডের ভিতরে অন্যায় বা পাপ বন্ধ করে। এভাবে রোযা আমাদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব বা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক,

রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে শুধু একজনেরই ভয় একজনেরই ভালবাসা কার্যকরী করে। গোটা জীবনকে তাওহীদের জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করায়।

ইসলামের অন্যান্য ইবাদত বিশেষ করে নামাযের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব তো নয়ই এমন কি একটা ক্ষুদ্র অঞ্চলের সকল মুসলমানও এক সঙ্গে একত্রিত হতে পারে না। হজ্জ হলো ইসলামের একমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদত যেখানে পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলিম উপস্থিত হয়ে এক বিশ্ব অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। সেখানেও পৃথিবীর গোটা মুসলিম জনসংখ্যার খুব সামান্য অংশই একসাথে উপস্থিত থাকে।

রোযার মাধ্যমে একটা বিশাল এলাকার (তা কয়েকটি দেশ সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল ভৌগলিক অঞ্চল হতে পারে) মুসলিম জনগোষ্ঠি একই সময়ে ইফতার করে, সেহরী করে। গোটা দেশ ও অঞ্চলের বিশাল জনসমুদ্র নানা ক্ষেত্রে ও নানা প্রকারের কাজের মধ্যেও সম্মিলিতভাবে সবাই এক আল্লাহর দাসত্ব করে। সময়ের আপেক্ষিকতায় সামান্য তারতম্য বাদ দিলে গোটা বিশ্বের সকল মুসলিম রোযার মাধ্যমে দিন–রাতের একটা বিরাট অংশে আল্লাহর একত্ববাদের সুনিপুণ প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যেকার বর্ণ, গোত্র, কর্মক্ষেত্র, পেশা বা অন্য সব ভেদাভেদ ও পার্থক্য চুর্নবিচুর্ণ হয়ে তাওহীদের মধ্যে একাকার হয়ে যায়। অন্য কোন কৃত্রিম মতপার্থক্য তাদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না।

তারা হিংসা করতে পারে না, রাগ দেখাতে পারে না, কারও ক্ষতি করার চিন্তাও করতে পারে না। সবাই সবার জন্য কল্যাণকর, শান্তিদায়ক ও হিতাকাঙ্খী হয়ে যায়। নির্ভেজাল তৌহিদের সম্মিলিত প্রশিক্ষণ পৃথিবীর বিশাল জনগোষ্ঠিকে এভাবেই একত্রিত করে, ঐক্যবদ্ধ করে রোযার মাধ্যমে। শতধাবিচ্ছিন্ন মানুষকে রোযা একমুখী করে দেয়।

সবার সাধনা আল্লাহকে পাওয়া, আল্লাহকে খুশি করা হয়ে দাঁড়ায়। রোযা আল্লাহকে পাওয়ার শতমুখী প্রচেষ্টাকে একটি একক প্রচেষ্টার ভিতরে নিয়ে আসে।

ইমাম : জাল ও চুম্বক

মসজিদ হলো মুসলমানদের সকল সামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র। মুসলমানদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের জন্যে যে সব ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন, প্রতি দিন দুবার তাঁদের দল পরিবর্তন হয়। একবার বাদ ফজর, আরেকবার বাদ আসর। দল পরিবর্তনের কাজটি হয় মহল্লার মসজিদে। ঐ মহল্লার সকল ফেরেশতা প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযে মসজিদে হাযির হন। ফেরেশতাদের যে দলটি ফজর থেকে আসর পর্যন্ত থাকেন, তাঁরা আসরের পর নির্দিষ্ট ব্যক্তির আমলনামা যাঁরা আসর থেকে ফজর পর্যন্ত সময়ের জন্যে আসছেন তাঁদেরকে বুঝিয়ে দেন। দ্বিতীয় দলটি পরের দিন ফজরে আগত দলের নিকট ঐ ব্যক্তির হিসাব বুঝিয়ে দেন। সে হিসাবে ফজর ও আসরে দু সময়ের পরিবর্তনকারী দু দল ফেরেশতার মিলন ঘটে। সেজন্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে এ দৃষ্টিভঙ্গিতে ফজর ও আসর নামাযের জামাতে উপস্থিত থাকার গুরুত্ব দেয়া হয়। যখন কোন ব্যক্তি ফজর বা আসরের জামাতে উপস্থিত থাকেনা তখন তার ফেরেশতা তাকে অনুপস্থিত হিসাবে উল্লেখ করে। আবার যখন কোন ব্যক্তি ফজরের জামাতে হাজির থাকেনা তখন ঐ সময়ের ফেরেশতা তাকে অনুপস্থিত দেখায়। এভাবে কোন ব্যক্তি ফজর ও আসর দু ওয়াক্তেই হাযির না হলে তিনি দু দল ফেরেশতার হিসাবেই অনুপস্থিত হয়ে যান।

এ সূত্র থেকে বুঝা যায়, কোন এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন যাবতীয় বিষয়াদির ফায়সালা হয় মসজিদ কেন্দ্রিক। মহান আল্লাহর নিকট থেকে ফেরেশতারা মানুষের জন্যে রহমত বরকতসহ যা কিছু আনেন তা মসজিদকে কেন্দ্র করেই বিতরণ করা হয়। সে হিসাবে মসজিদের ইমামদের যোগ্যতা দক্ষতা ও আন্তরিকতা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মাহে রমযানে বান্দার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে অসীম দয়া ও ক্ষমা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির যে অবিস্মরণীয় উপহার প্রেরণ করেন তা সঠিকভাবে মুসল্লিদের হস্তগত হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের অবশ্যই অনেক কিছু করার আছে।

পবিত্র রমযান মাসে শয়তানের অনুপস্থিতিতে অন্য সময়ে আসেন না এমন অগণিত মানুষ নিয়মিত মসজিদে আসা শুরু করেন। একটি ভাল খুতবা অনেকের মনে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। একটি সুন্দর দুআতে হতাশ মানুষের মনে আশার সঞ্চার হতে পারে। একটু ভাল ব্যবহারে পাক্কা বেনামাযীর মন বিগলিত হওয়া সম্ভব। সামান্য সাহায্য সহযোগিতার উদ্যোগ গোটা পরিবেশে রমযানের স্থায়ী সুফল প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

- ইমাম হলেন জাল, মুসল্লিরা মাছ।
- ইমামগণ চুম্বক, মুসল্লিগণ লোহার গুড়া।

আষাঢ়ের বাদল ধারায় পুকুর খাল বিল ডুবে যায়। স্রোতের টানে মাছ উজানের দিকে ছোটে। মাছ শিকারীদের চোখে ঘুম থাকে না। একইভাবে জোয়ারের সময় সাগরের পানি উপরে উঠে। জেলেরা তৈরি হয় জাল ফেলতে। ভাটার টানে পানি যখন নামবে জোয়ারের সাথে আসা মাছগুলিতে জাল ভরে যাবে।

ভাল মাছ ধরতে হলে ভাল জালের কোন বিকল্প নেই। জাল যদি ছেঁড়া হয়, ফাটা হয়, দুর্বল হয়, ঠিকমত আটকানো না থাকে, সময়মত ফেলা না হয়, তাহলে চোখের সামনে মাছের লাফালাফি দেখলেও জালে মাছ আটকানো যায় না। রমযানের জোয়ারে মসজিদে মুসল্লির ঢল নামলেও ইমামদের অসতর্কতার কারণে ফাঁক ফোঁকর দিয়ে সব বের হয়ে যেতে পারে।

চুম্বকের ধর্ম হলো লোহার টুকরাকে নিজের কাছে নিয়ে আসা। যত শক্তিশালী চুম্বক, তত দূরত্বের লোহা ছুটে আসে। চুম্বকের গুণাগুণের উপরে নির্ভর করে, কতগুলি লোহার টুকরা কতক্ষণের জন্য চুম্বকের সাথে আটকে থাকবে। অনেক শক্তিশালী চুম্বক তার সংস্পর্শে আসা লোহার টুকরাকে চুম্বকে পরিণত করতে পারে।

ইমামগণ হবেন শক্তিশালী চুম্বকের মত। রমযানের সুবাদে হাজারো মুসল্লি নামক লোহার টুকরা মসজিদে আসে। ইমামের সংস্পর্শে এক মাসের পরশে চুম্বকে পরিণত হবে।

রমযানে ইমামগণ একদিকে নিজেরা স্থায়ী প্রখর শক্তির চুম্বকত্ব অর্জন করবেন, অন্যদিকে হাজারো মুসল্লিকে স্থায়ীভাবে রমযান শেষেও ধরে রাখতে সমর্থ হবেন।

রমযান ও কুরআন : বর্ষাকাল ও বৃষ্টি

গ্রীষ্মের তাপদাহে বিদ্ধস্ত প্রকৃতি। মাটি ফেটে চৌচির, গাছপালা মৃতপ্রায়। এভাবে আর বেশি দিন চলে না। দিনকয়েকের মধ্যেই আসছে বর্ষাকাল। সবাই অধীর আগ্রহে পেট ভরে বৃষ্টির পানি পানের অপেক্ষায়। বর্ষা এল সময়মত।

শুরু হলো মুষল ধারায় বৃষ্টি। থেমে থেমে বৃষ্টি সারাদিন। কখনও ২-৩ দিন একনাগারে চলে ঝমঝমা বৃষ্টিপাত। সবাই যার যার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ভরে নিচ্ছে নিজ নিজ ভান্ড। আশপাশের সবকিছু পানিতে ভরাট, তবুও থামেনা বৃষ্টি। ছোটখাট ডোবা নালা দূরে থাক, বড় বড় পুকুর দিঘী উপচে পানির স্রোত মিশে নদীতে। প্রায় শুকিয়ে যাওয়া নদী ফিরে পায় উন্মত্ত যৌবন। কি লাফালাফি তার। দূরন্ত দূর্বার বেগে ছুটে চলে সাগরের সাক্ষাতে। গ্রীষ্মের প্রখরতা কেটে জেগে ওঠে পৃথিবী, সজীব হয় প্রকৃতি। সচল হয় জীবনের গতি। শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্তের দিনগুলি নানা বৈচিত্রের ভিতর দিয়ে পার করে জীবন ধীরে ধীরে আবার মুখোমুখি হয় রুক্ষ গ্রীষ্মের। সুদীর্ঘ এসময় জীবন পরিচালিত হয় বর্ষায় জমানো পানি দিয়েই। গ্রীষ্ম এসেই শুরু করে জালাও পোড়াওয়ের তান্ডব। তীব্র রৌদ্রে মুহূর্তে শুকিয়ে শূন্য করতে চায় সে সাগরকেও। সাইজ অনুযায়ী শুকাতে থাকে একটার পর একটা ভান্ড। কঠিন দুর্দিন নেমে আসে আবার। সবাই হা করে অপেক্ষা করে বর্ষার।

মসজিদের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বৃষ্টির নিরবিচ্ছন্নতায় একটি অন্ধকার ভাব। বেশ দূরে লম্বা কতগুলি গাছ নযরে এলো। নিথর নিঝুম দাঁড়িয়ে আছে। পাতাগুলি পর্যন্ত নড়ে না। ওদের মনে হয় পানির খুব প্রয়োজন। একান্তভাবে প্রাণভরে অবগাহন করছে বৃষ্টির ধারা। নিশ্চুপ নিঃশব্দে পান করছে বৃষ্টির পানি। গোটা শরীরের সর্বত্র অফুরন্ত ফোটা একাধারে পড়ুক সে জন্যে নড়াচড়া নেই। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে আধ ঘন্টা খানেক।

কিছুক্ষণ পরে এলো বাতাস। সেই গাছগুলির কি সে লাফালাফি। কিছুক্ষণ আগের নিস্ক্রিয় ডালপালাগুলি হেলেদুলে আনন্দ প্রকাশ করছে। খুব সক্রিয় প্রত্যেকটা পাতা পর্যন্ত। যেমন ডায়রিয়া আক্রান্ত ডিহাইড্রেশন হওয়া নিস্তেজ শিশুকে সালাইন পুশ করার ঘন্টাখানেকের মধ্যে হাত পা ছুঁড়ে জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দ প্রকাশ করে ঠিক তেমনই গাছগুলির অবস্থা।

মনে হলো আকাশ থেকে তো আরও একটা জিনিষ আমাদের কাছে এসেছে। সেটা হলো আল-কুরআন। শয়তানের আক্রমণে নিস্তেজ হয়ে পড়া মানুষকে সজীব করার জন্য। কুরআন অবতীর্ণের সময় রসূলুল্লাহ (স.) কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে রসূল শান্তভাবে শ্রবণ কর অস্থির হয়ো না তাড়াহুড়া কোরো না। আমাদের জন্যেও বলা হয়েছে নামাযে বা

অন্য সময় যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন স্থিরভাবে মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ কর, যাতে করে তোমরা ফায়দা হাসিল করতে পার। গাছগুলির জন্য কুরআন নাযিল হয়নি তাদেরকে বৃষ্টির সময় কেমন থাকত হবে, সৃষ্টি লগ্নে বলে দেয়া হয়েছে। সারাজীবন ওরা সেটা মেনে চলছে স্রষ্টার প্রেরিত বৃষ্টি ধারা শান্তভাবে গ্রহণ করছে।

অন্যদিকে মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন। রসূলুল্লাহ (স.) ঠিকই ধীরস্থিরভাবে কুরআন গ্রহণ করতেন। কিন্তু আজ আমরা কুরআন শোনার সময় স্থির থাকি না, মনোযোগ দেই না। বসে থাকি উঠে যাই। এমনকি কুরআন নাযিলের মাস রমযানেও আমরা একটুও কুরআনের কাছে দাঁড়াইনা, অপেক্ষা করি না এর স্রোতে অবগাহন করতে। একটুও সময় দেই না পুরো শরীর মন ভিজে সিক্ত হতে, গোড়াতে পানি জমতে। ছটফট করি, নড়াচড়া করি। গোটা শরীর ধৌত করেও তৃপ্তি পাই না।

গাছগুলি জানে গোড়াতে পানি জমিয়ে রাখতে হবে কোষেও ধারণ করতে হবে। কারণ সামনে গ্রীষ্মকাল। যেন অসুবিধা না হয়। গোটা মানব সমাজে আজ যে বিকৃতি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা, কুরআনের বাণী গ্রহণ না করে সামনে কঠিন সময় বেঁচে থাকব কিভাবে?

আরও একভাবে বুঝানো যায় কুরআনের গুরুত্ব। ডাইরিয়া আক্রান্ত এক শিশু। যার শরীর পানিশূন্যতায় নিস্তেজ হয়ে গেছে। জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ, শরীর ফ্যাকাশে। সবাই হতাশ। শিশুটির জীবন বাঁচাতে সে মুহূর্তে অতীব প্রয়োজন স্যালাইনের। শিশুটির শরীরে একটি স্যালাইন পুশ করলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্যালাইন তার রক্তের মাধ্যমে শরীরের কোষে পৌঁছে যাবে। অল্প কিছুক্ষণ পরে তার জিহ্বার শুষ্কতা চলে যাবে। সে হাত-পা নাড়াচাড়া করবে এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে।

প্রবল পরাক্রান্ত জঘন্য শত্রু শয়তানের আক্রমণে মানুষের জীবন প্রায় নির্জীব নিথর হয়ে গেছে গত এগারটা মাসে। রমযানের আগমনে কুরআনের সংস্পর্শে আমরা নতুনভাবে ফিরে পাব জীবন। এটাই মহান স্রষ্টার প্রত্যাশা।

বর্ষার স্রোতধারা থেকে লাভবান হয়না মৃত উদ্ভিদ, পাথর অথবা নির্জীব পদার্থ। কুরআনের আগমনেও তেমনি উপকৃত হয়না বিবেক বিবেচনা ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মানুষেরা। একইভাবে যে শিশুটি পানিশূন্যতায় জীবন হারিয়ে ফেলেছে, স্যালাইন তার শরীরে প্রবেশ করেনা। ডাক্তার বলবেন, অনেক দেরী হয়ে গেছে, সব শেষ। এখন আর কিছু করার নেই, দুঃখিত।

দুআ ও কান্না

এ পৃথিবীতে মানুষের অসহায়ত্বের শেষ নেই। দুঃখ বেদনা কান্নার কোন সীমা নেই। প্রতিদিন পত্রিকা রেডিও টেলিভিশনে কত অসহায়ত্বের খবরা-খবর দেখা যায়। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে লেখা হয় কত কাহিনী। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কত রকমের অসহায় মানুষ আছে, আমরা কম্বজনের খবর রাখি। এরকম কোটি কোটি অসহায় মানুষের অসহায়ত্বকে একত্রিত করলেও ঐ অসহায়ের মত হবে না যে ব্যক্তি রমযান মাস পেল, কিন্তু নিজের গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলো না, গোনাহ মাফের জন্য কাঁদলনা। সর্বোপরি আল্লাহর কাছ থেকে নিজের গোনাহ মাফ করাতে পারলো না। মাফ পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চোখের পানি। নিজের গোনাহ মাফের জন্যই বেদনা নিয়ে কাঁদতে হবে। বার বার, প্রতিদিন আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে। যে সকল সাহাবীদের পূর্ব এবং পরের সব গুনাহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিয়েছিলেন তারাও তো কাঁদতে কাঁদতে রাত পার করে দিতেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দার চোখের পানিকে খুব পছন্দ করেন। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে চোখ জাহান্নামের আগুনে পুড়ে না।

দু'টি কারণে মানুষের চোখে পানি আসে। প্রথম কারণ হল, যখন মানুষ কোন বেদনায় পড়ে, খুব বেশি কষ্ট অনুভব করে বা অসহায় হয়ে পড়ে তখন চোখ থেকে পানি আসে। দ্বিতীয় হল যখন কোন মানুষ অনেক বেশি আনন্দিত হয় তখন তার চোখ দিয়ে পানি বের হয়।

রমযান নামক এক মহা সুযোগ জীবনে আরও একবার পেয়েছি এ আনন্দে আমাদের চোখে পানি আসা উচিত। অন্যদিকে এ সুযোগ হাতছাড়া হলে মহা সর্বনাশ এ ভয়েও কান্না আসার কথা।

আপনার লক্ষ্য যদি সুনির্দিষ্ট হয়, অবস্থান যদি চিহ্নিত হয়, সুযোগের সীমাবদ্ধতা যদি বুঝতে সক্ষম হন, তাহলে আপনার চোখের কোণে বিরতিহীন পানির প্রবাহের কোন বিকল্প নেই। এবারের রমযানকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য জীবনের সর্বশেষ সুযোগ মনে করুন। নিজের অন্যায় অপরাধের পাহাড়সম চিত্র মনের চোখে উপলব্ধি করুন। ভাবুন, যদি এবারও মাফ না পান কি দুর্ভাগ্য হবে আপনার। এভাবে যতই আপনি রমযানের শেষের দিকে অগ্রসর হবেন, ততই আপনার আবেগ ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। না জানি আপনি ক্ষমা পেয়েছেন কি না, মুক্ত হয়েছেন কি না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটানা লেগে থাকুন। শাওয়ালের চাঁদ দেখার সংবাদ কানে আসা পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। চোখের পানিতে পাপরাশিকে ধুয়ে ফেলুন।

অন্যদিকে রমযানের প্রত্যেকটি দিনে রোযা পালন, তারাবিহ তাহাজ্জুদ আদায়সহ যাবতীয় সুকর্মসমূহ সঠিকভাবে পালন করার পর আপনি আনন্দ অনুভব করুন। আপনার মন পুলকিত হোক। চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হোক। রমযান যতই বিদায়ের দিকে অগ্রসর হবে, আপনার কার্যক্রম ততই সমৃদ্ধ হবে এবং আপনি ততই আবেগ আপ্লুত মনে প্রভুর দরবারে শুকরিয়া জানিয়ে দু'চোখের পানি প্রবাহিত করবেন। সে হিসাবে রমযানে প্রকৃত মুমিনের কান্না দু'দিক থেকেই পরিপূর্ণ। এক ভয়ের কান্না, অন্যদিকে আনন্দের কান্না।

কিছু দুআ

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা

হে আল্লাহ, আমার অতিশয় সুমহান মালিক। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করছি যে, আপনি ছাড়া আমার আর কোন ইলাহ্ নেই। আপনি এক এবং একক। আপনার কোন শরীক নেই। সমস্ত জ্ঞান ও সম্পদের মালিক আপনি। আপনার হাতেই সকল ক্ষমতা। আমাকে আপনিই সৃষ্টি করেছেন, বড় করেছেন, বাঁচিয়ে রেখেছেন। আপনার কাছেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। আপনার হাতেই দোযখ ও বেহেশতের চাবি। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মদ (স.) আপনার বান্দাহ ও রসূল। আপনি আমার এ ঘোষণাকে কবুল করুন। আমাকে আপনার প্রিয় মুমিন বান্দাহদের মধ্যে শামিল করুন। এ ঘোষণা দিলে যে কল্যাণ বরকত ও উপকার পাওয়ার কথা তা পরিপূর্ণভাবে আমাকে দান করুন। এ ঘোষণা দিলে যেসব দায়িত্ব আমার উপরে বর্তায় তা পালন করার তৌফিক দিন। যেসব চিন্তা চেতনা ও কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করতে হয় সেগুলো থেকে হেফাজত করুন।

আপনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। যেসব আমি বুঝতে পেরেছি, যেগুলো আমি বুঝিনি, যেসব আমি দেখেছি এবং যেগুলো আমার চোখে পড়েইনি, তাছাড়া আমি কোনদিন আপনার নিয়ামতের সংখ্যা গণনা করে শেষ করতে পারবনা। আপনার সমস্ত অনুগ্রহের কথা আমি নিঃশঙ্কচিত্তে স্মরণ করছি এবং আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনি আমাকে আপনার কৃতজ্ঞ বান্দাহদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন। আমি যেন প্রতিনিয়ত আপনার অনুগ্রহের কথা মনে করি এবং আপনি খুশি হন এমনভাবে আপনার প্রশংসা করতে পারি। হে আমার একান্ত দয়ালু মনিব, আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহের পরিমাণ উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি করুন। হে আল্লাহ, আপনি গোটা বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। আপনি একেবারে নিজস্ব সিদ্ধান্তে আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন। আমাকে জীবন দিয়েছেন, প্রাণী বানিয়েছেন, মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। কেবলমাত্র আপনার একক সিদ্ধান্তে আমি মুসলিম পিতা-মাতার সন্তান হয়েছি এবং সে সুবাদে কোন চেষ্টা তদবির ও যোগাড়-যন্ত্র ছাড়াই আমি মুসলমান হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আপনার দয়ার এক অনুপম প্রাপ্তি আমার ভাই ও বোনেরা। কত আত্মীয়-স্বজন দিয়েছেন আপনি। কত বন্ধু-বান্ধব দিলেন। জীবনের প্রিয়তম সাথী একান্ত স্ত্রী/স্বামীও আপনিই দিলেন। এরপরে আপনার অপার মহিমার উজ্জ্বল নমুনা হিসাবে আরও দিলেন সন্তানাদি।

আপনি আমাকে লেখাপড়া করালেন, উচ্চ শিক্ষিত বানালেন। চাকুরি দিলেন, প্রমোশন দিলেন। ভাল ওস্তাদ দিয়ে ভালভাবে কুরআন শিক্ষা করালেন। ভাল ডাক্তার দিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করালেন। নামাযী বানালেন, রোযা রাখতে সাহায্য করলেন, হজ্জ করালেন, যাকাত দিতে সামর্থ দিলেন। এসব কিছুর জন্যে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জানাই।

রমযান প্রাপ্তি

হে আল্লাহ, আমার সুমহান মালিক। আপনি অতীব দয়ালু। আপনি দয়া করে আমাকে আরও একবার মহিমান্বিত রমযান মাস পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এ মাস পাওয়ার মত কোন যোগ্যতা আমার ছিল না। গত বছর রমযানে আমি তেমন কিছুই করতে পারিনি। রমযান চলে যাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত দ্বীনের পথে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ করিনি। এমনকি এবারের রমযানকে স্বাগতম জানানোর জন্যও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। আমার মত অপদার্থের ভাগ্যে আবার একটি রমযান আসার কথা নয়। কিন্তু শুধুমাত্র আপনার অসীম অনুগ্রহে আপনার অপার করুণায় আমি আবারও রমযান পেয়েছি। সারাটা বছর যে অপকর্ম করেছি তাতে আমার উপরে আকাশ ভেংগে পড়ার কথা। তা না করে আপনি আমাকে লাইলাতুল কদরের মাস দিয়েছেন। এটা যে আমার প্রতি কতবড় অনুগ্রহ তা কেউ না বুঝলেও আমার বুঝা উচিত। আপনার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। সত্যিই আপনি অতীব মহান। আমার প্রার্থনা কবুল করুন। আমার অতীত ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করুন এবং আমাকে মাহে রমযানের সকল ফজিলত অর্জনের জন্য সাহায্য করুন। সকল অযোগ্যতা সত্বেও যখন আপনি আমাকে এটা দিয়েছেন, আমি যেন এর পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারি সে তওফিক দিন। আমাকে সাহায্য করুন, আমি যেন অবহেলা না করি। হে আমার দয়ালু মনিব, আপনি তো জানেন, মাহে রমযানকে সঠিকভাবে উদযাপন করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার মত চারপাশে তেমন আর কেউ নেই। আপনার দয়ায় পাওয়া এ মাসকে আপনার দয়া ও সাহায্য ছাড়া আমি কিভাবে পালন করব? আপনি বিশেষভাবে আমাকে সহযোগিতা করুন। আমি আপনাকে কথা দিলাম, না চাইতেও যখন আপনি আমাকে এ সৌভাগ্য মাস দিয়েছেন, আমি এর সুফল হাতছাড়া করব না। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব এটাকে সফল করতে। আমার ভুল ভেংগেছে, আমার হুঁশ হয়েছে। আপনি আমাকে কবুল করুন। আপনার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আপনি আমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। তা না হলে তো আমাকে এ মাসটা দিতেন না। আমার অপরাধের যে অবস্থা তাতে এ মাস আসার আগেই আপনি আমাকে উঠিয়ে নিতেন। সুযোগটা থেকে বঞ্চিত করতেন। তা যখন করেননি, তখন নিশ্চয় আপনি আমাকে বাঁচাতে চান। আমিও এখন উজ্জীবিত হয়েছি, আমার মধ্যে সাহস সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয় আমি পারব। আপনার সাহায্যে আমি রমযানে অসাধ্য সাধন করব। শুধু আপনি আমার পাশে থাকুন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি আজ খুবই আনন্দিত। জীবনে আরেকটা রমযান পেয়েছি।

একটি সকাল

আমি আপনার শুকরিয়া জানাই সারা রাত সুন্দর ঘুম দেয়ার জন্য। ফজরের নামায সময় মত আদায় করার তাওফিক দেয়ার জন্য। আপনি দয়া করে আমার নামায কবুল করুন। আজকে যদি সারা দিন আমার হায়াত দিয়ে থাকেন, তাহলে ঈমানের সাথে ইসলামের উপর আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। নিষ্ঠা ও সতর্কতার সাথে সচেতনভাবে চলতে সাহায্য করুন। আমার আজকের সারাটা দিনের সকল কাজের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন। সকল কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে দিন। (আজ যে সব কাজ করতে হবে সেগুলোর তালিকা)

আপনি সাহায্য না করলে, আপনি না চাইলে এর একটিও আমি শেষ করতে পারব না। আর যদি আমার হায়াত শেষ হয়, আপনি আমাকে উঠিয়ে নেন, তাহলে দয়া করে আমাকে ঈমানের সাথে ইসলামের উপরে উঠিয়ে নিবেন। আপনার উপরে দৃঢ় আস্থা ভয় ও ভালবাসাসহ আমাকে মৃত্যু দিবেন। মৃত্যুর পর আপনার প্রিয় বান্দাহদের সাথে যেমন ব্যবহার করেন, আমার সাথে সেরূপ আচরণ করবেন। আমাকে মৃত্যুর আযাব থেকে রক্ষা করবেন, কবরের শাস্তি থেকে বাঁচাবেন। হাশরের মাঠের সকল দুঃখ কষ্ট ও অপমান লাঞ্ছনা থেকে হেফাজত করবেন। আপনার আরশের ছায়াতলে আমাকে স্থান পাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। মুহাম্মাদ (স.) এর হাতে হাউজে কাওসারের পানি নসিব করবেন। আমার হিসাব খুব সহজ করবেন এবং আমলনামা ডান হাতে দিবেন। মিজানে আমার পুণ্যের পাল্লা ভারী করবেন, চোখের পলকে পুলসিরাত পার করে দিবেন। রোযা এবং কুরআনকে আমার জন্য সুপারিশকারী হিসাবে নির্ধারণ করবেন, দয়া করে দোযখ থেকে বাঁচিয়ে দেবেন। আর অনুগ্রহ করে জান্নাতুল ফিরদৌসে প্রবেশ করাবেন। সেখানে আপনি দয়া করে আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েকে আমার সাথে রাখবেন। আমার আব্বা-আম্মা-দাদা-দাদী-নানা-নানী-শশুড়-শাশুড়ী, আমার স্ত্রীর দাদা-দাদী-নানা-নানী, আমার ভাই ও বোনদেরকে এবং আমার স্ত্রীর ভাই ও বোনদেরকে আমার পাশে রাখবেন। আমার সকল আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং আমার সকল দ্বীনি ভাইবোনদেরকেও সেখানে উপস্থিত রাখবেন দয়া করে।

একটি দুপুর

হে আল্লাহ, আমাকে এ ওয়াক্ত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন, কাজ করার সামর্থ দিয়েছেন এবং নামায আদায় করার তৌফিক দিয়েছেন, এজন্য আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনি আমার নামাযকে কবুল করুন, আমার গুনাহ ক্ষমা করুন। পরবর্তী নামায সময়মত জামাতের সাথে আদায় করার জন্য সাহায্য করুন। এ সময়ের মধ্যে আমার দায়িত্বে যে সব কাজকর্ম আছে সেগুলি সুন্দরভাবে সহজভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করুন। সঠিকভাবে রোযা পালনে সাহায্য করুন।

সন্ধ্যায় একাকী

ওগো আমার মহান মালিক। দেখুন সারাটা দিন রোযা রেখে ইফতার করেছি। মাগরিবের জামাত ধরেছি একরকম তাড়াহুড়া করে। মসজিদ এখন একদম ফাঁকা। মুসল্লিরা সবাই চলে গেছে। কেউ ইফতারীর বাঁকি অংশ শেষ করবে, কেউ একটু বিশ্রাম নিবে। আমি একা মসজিদে বসে আছি আপনার কাছ থেকে বিশেষ কিছু পাওয়ার জন্যে। আপনি আমাকে হতাশ করবেন না। ইফতারীতে আপনি আমাকে কত কিছু খাওয়ালেন। এর সবকিছু তো আমি চাইনি। এগুলি সব আমার নিজের অর্জন সেটাওতো আমি দাবী করিনা। করতে পারিনা। না চাইতেই এতসব যিনি দিলেন, তাঁর কাছে আবদার রাখি, বেহেশতের নিয়ামতেও একইভাবে ভাগ দিবেন। দুনিয়ার নিয়ামত পেয়ে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, বেহেশতের নিয়ামত পেয়েওতো নিশ্চিত শুকুরগুজার করব প্রভু। আপনার অবস্থাতো এমন নয় যে দুনিয়াতে দিলে আর পরকালে দিবেন না। দুনিয়াতে এত কিছু না হলেওতো চলত। কিন্তু পরকালে বেহেশত না হলে যে চলবে না। যেখানে না পেলেও চলে, সেখানেই যিনি আমাকে দিলেন, তিনি যেখানে না পেলে চলবেনা, সেখানে না দিয়ে পারেন কিভাবে? আমার এ অনুভূতিকে পছন্দ করুন প্রভু। এশা তারাবিহসহ রাতের রমযানকে যথাযথভাবে পালন করার তাওফিক দিন। প্রয়োজনীয় ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতা বাড়িয়ে দিন। আগামী রোযাগুলিকে আরও বিশুদ্ধভাবে রাখার ব্যবস্থা করে দিন।

যখন মুতাকিফ

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আমার প্রিয়তম সম্পর্ক-সম্বন্ধ থেকে সরিয়ে এখানে এনেছেন। এখানে আমি সহজে আসিনি, আসার মত কোন অবস্থাও ছিল না। আপনি সাহায্য করেছেন সম্ভব করেছেন। এখন দয়া করে এটাকে সফল করুন, কবুল করুন।

আমার মধ্যে আপনার ভালবাসা ভয় ও আনুগত্যকে পরিপূর্ণ করে দিন। আপনার রং এ আমাকে রঙিন করুন প্রভু। আপনার রং ধারণের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করুন মনিব। আপনার পরিচয় গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ আমার কাছে আরও সুস্পষ্ট স্বচ্ছ ও কার্যকরী করুন। আমার প্রতি আপনার দয়া সাহায্য সহযোগিতার পরিমাণ বৃদ্ধি করুন এবং আপনার সাথে সাক্ষাত পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখুন।

আমার ভুল ত্রুটি গুনাহ-অপরাধ পেছনে ফেলে এসেছি। এগুলিকে আমার থেকে আলাদা করুন। আমাকে মাফ করুন। আমার আমলনামা থেকে এসব মুছে ফেলুন, পরিষ্কার করে দিন। দোষত্রুটি নিয়ে আপনার দরবারে থাকা বেমানান মনে হয়। অস্বস্তি লাগে, লজ্জা পাই। সহজ হতে পারি না। হঠাৎ যদি কোনটা ধরে ফেলেন, প্রকাশ করেন, তাহলে তো বেইজ্জত হয়ে যাব। এত সম্মান ও মর্যাদার স্থানে এনে বেইজ্জত করবেন না মালিক। দয়া করে ক্ষমা করে দিন। পেছনের অপরাধগুলো অতীত বানিয়ে দিন। স্বস্তি শান্তি আনন্দ উপভোগের মধ্যে কয়েকটি দিন অতিবাহিত করতে দিন। সাহায্য করুন।

আপনি আমাকে এমন কিছু দিন, এমন ভাবে রাখুন, যেন পেছনের কোন কিছু মনে না আসে। অন্য আর কেউ যেন আমাকে আকৃষ্ট করতে না পারে। আমি কেবল আপনারই হয়ে থাকতে চাই।

যদি আপনি আমাকে একবারে নিয়ে নেন, তাহলে পরিশুদ্ধ করে নিন। আপন করে নিন। সম্মান ইজ্জতের সাথে নিন। জীবনের পরবর্তী ধাপগুলিতে দুঃখ, কষ্ট, অপমান, শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। জান্নাতুল ফেরদৌসে আপনার দিদারে ধন্য করুন।

আর যদি আবার আমাকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে জ্ঞান গরিমা আমল আখলাক যোগ্যতা দক্ষতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিন। সমাজের অবস্থা পৃথিবীর অবস্থা মানুষ ও প্রকৃতির যে অবনতি রেখে এসেছি ফিরে দেখব আরোও অনেক অবনতি। সেখানে আপনার হয়ে কাজ করার জন্য আগের তুলনায় অনেক বেশি যোগ্যতা দক্ষতা লাগবে, টাকা-পয়সা লাগবে, জনশক্তি লাগবে। এগুলির ব্যবস্থা করে দিন। যে সব ভাল কাজ অসুম্পূর্ণ রেখে এসেছি, সেগুলো সম্পুর্ণ করার জন্য সাহায্য করুন।